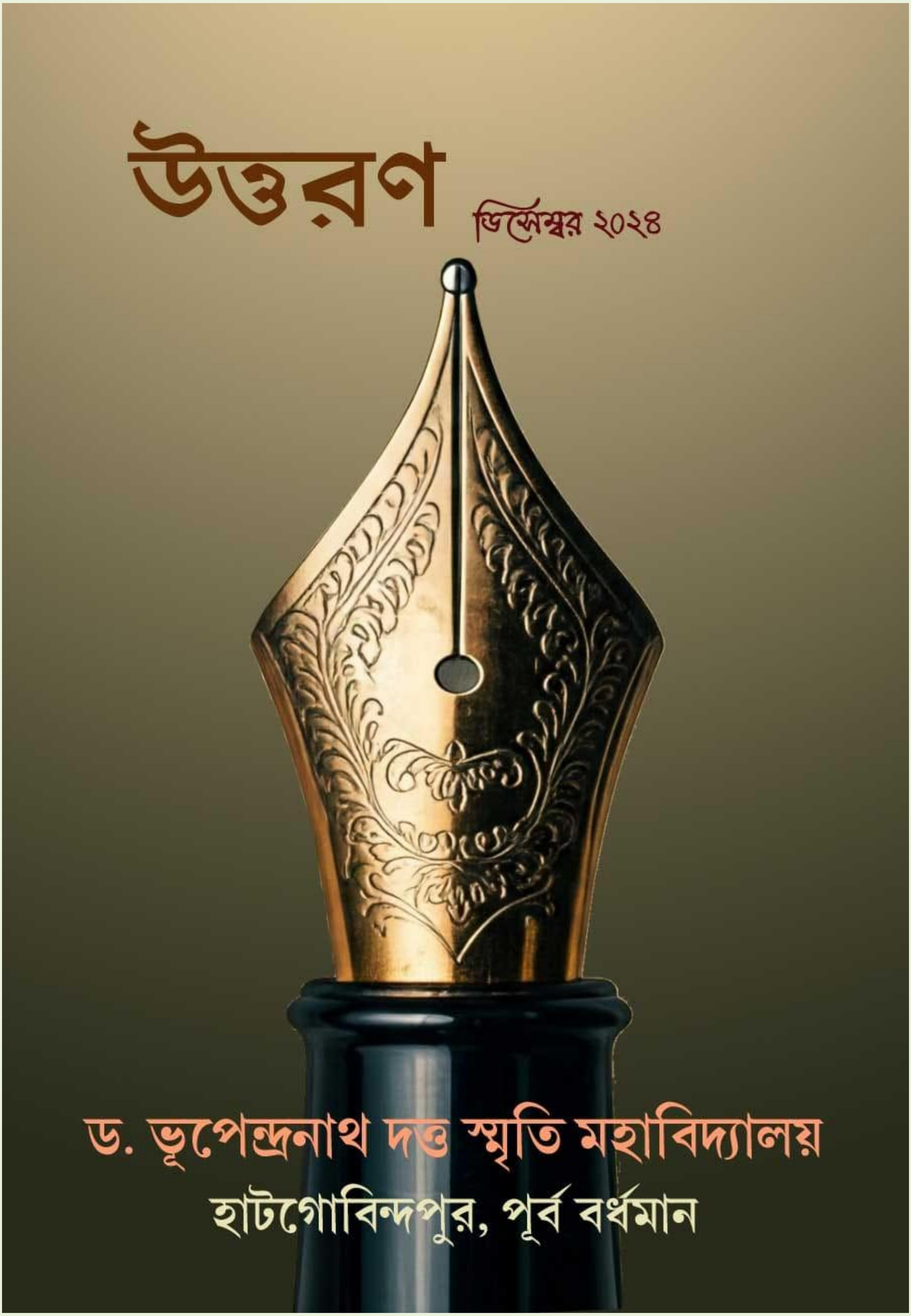
উত্তরণ
ডিসেম্বর ২০২৪
ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
হাটগোবিন্দপুর, পূর্ব বর্ধমান

প্রকাশক ঃ ড. অমল কুমার ঘোষ
অধ্যক্ষ, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
হাটগোবিন্দপুর, পূর্ব বর্ধমান
পিন – ৭১৩৪০৭

পত্রিকা সম্পাদক ঃ ড. মঞ্জরিতা চক্রবর্তী
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

মুদ্রণ ঃ বিধান চন্দ্র ঘোষ

প্রকাশ কাল ঃ ডিসেম্বর, ২০২৪

শুভেচ্ছাবার্তা

মহাবিদ্যালয়য়ের বার্ষীক পত্রিকা উত্তরণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। এটি ছাত্রছাত্রীদের লেখনির দর্পণ, প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। তাদের ধ্যানধারনা স্ফুরনের মুর্ত দলিল। সৃষ্টিশীলতার বার্তাবাহক। দৈনন্দিন পড়াশোনার মাঝে অন্য স্পর্শ। অনন্য অনুভূতি। হোক সৃষ্টি-

অধ্যক্ষ

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয় পত্রিকা **“উত্তরণ”**

সম্পাদকীয়

ড.ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা ‘উত্তরণ’ মহাবিদ্যালয়ের সামগ্রিক সৃজনশীলতার একটি সবিনয় প্রকাশ। এটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাবার এবং তাদের ভবিষ্যত প্রয়োগ কুশলতাকে প্রস্তুতি দেবার একটি মঞ্চ। ছাত্রছাত্রীদের অপরিণত কিন্তু আবেগদীপ্ত মনের বিচ্ছুরণ এই পত্রিকায় স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাদের লেখাগুলি তাদের তিরস্কার ও পুরস্কারের মধ্য দিয়ে সুষম মানুষ হয়ে ওঠার এক অবিরাম প্রচেষ্টার নিদর্শন।

একটি গ্রামীণ কলেজ হিসাবে, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয় অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও উজ্জ্বল এক আলোকবিন্দু। বিশেষ করে, বেশি সংখ্যক উপজাতি ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি এই কলেজকে আরও ‘বিশেষ’ করে তুলেছে। এই বৈচিত্র্য কলেজের শিক্ষা পরিবেশকে সমৃদ্ধ করেছে। উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং চিরায়তজ্ঞানের সাথে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পৃক্ত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এই পত্রিকা সেই দায়িত্ব থেকেই সকল ছাত্রছাত্রীদের ভাবতে, সিদ্ধান্ত নিতে এবং লিখতে উৎসাহিত করেছে।

ক্রীড়াবিভাগের উজ্জ্বল সাফল্য এই কলেজের বহুমুখী প্রতিভার একটি দৃষ্টান্ত। ক্রীড়া শুধুমাত্র শারীরিক সক্ষমতার বিকাশ ঘটায় না, এটি শৃঙ্খলা, দলবদ্ধ কাজ, এবং সহনশীলতার মূল্যবোধ ও গড়ে তোলে। যা তাদের লেখার মধ্যে প্রকাশ পায়। এই মহাবিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে মুসলিম ছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তন। এই পত্রিকা সেই পরিবর্তিত সমাজ প্রেক্ষিতের সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করেছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, এবং নানা উৎসব পালনের মাধ্যমে ড. ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয় পাঠ্যসূচির বাইরেও ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তুলেছে। এই অনুষ্ঠানগুলি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, সহযোগিতা এবং নান্দনিক মানসিকতার বিকাশ ঘটায়। এই অনুষ্ঠানগুলি সংগঠিত করার বিভিন্ন পর্যায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। এগুলি তাদেরকে তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের এবং তাদের সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করার যে সুযোগ দেয়, তার মধ্য থেকেই গড়ে ওঠে ছাত্রছাত্রীদের সমসময় এবং জীবন সম্পর্কে মৌলিক মতামত।

এই মহাবিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও, তাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিমাণ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই উৎসাহ উদ্দীপনা বজায় রাখতেই পত্রিকায় কাঁচা লেখা ও প্রকাশ করা হয়েছে। তার পাশে অধ্যাপকগণের মেধাবী লেখাগুলি এবং শিক্ষাকর্মীগণের স্বতঃস্ফূর্ত রচনা পত্রিকার মান আরও উন্নত করেছে। অধ্যাপকগণের লেখাগুলি ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি দিকনির্দেশনা হিসাবে কাজ করেছে এবং তাদের লেখার দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করেছে। অধ্যাপকগণ তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে ছাত্রছাত্রীদের সাথে বিনিময়ের দ্বারা তাদের জীবনবোধ, নৈতিকতা এবং মুল্যবোধ নির্মাণ করেছেন।

আমাদের সকলের দায়িত্ব এই পত্রিকাকে আরও সমৃদ্ধ করা। ছাত্রছাত্রীদের সাহসী হয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করতে হবে। অধ্যাপকগণ তাদের নির্দেশনা দিয়ে তাদের উৎসাহিত করবেন। এই পত্রিকা শুধুমাত্র একটি পত্রিকা নয়, এটি হল মহাবিদ্যালয়ের আত্মা। এই পত্রিকা অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন, চেষ্টা এবং অভিজ্ঞতার একটি প্রতিফলন। মহাবিদ্যালয়ের অজস্র সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে গিয়ে, একটি সুন্দর জীবনবোধে উত্তীর্ণ হবার প্রতীক। এই পত্রিকা আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে, আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, যেখানে ইচ্ছাশক্তি আছে, সেখানে সম্ভাবনাও আছে। ক্রমাগত অনুশীলনে, প্রকাশের সাবলীলতায় মহাবিদ্যালয়য়ের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি মানুষের উত্তরণ সম্ভাবনাকে দ্যোতিত করেছে এই মহাবিদ্যালয় পত্রিকা।

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে

ড. মঞ্জরিতা চক্রবর্তী

সহযোগী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

ড. ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

সূচীপত্র :

মনে পড়ে	অধ্যাপক ড. অমল কুমার ঘোষ	৭
আমার হবে	পৃথা অধিকারী	৯
জীবন	সান্তনা সরেন	১০
শেষের সেদিন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ড. দেবব্রত গায়েন	১১
কালাপাহাড় ও শিবিক্ষা মন্দির ঃ প্রসঙ্গ সুরথেশ্বর রাজার ইতিহাস	আনসার আলি	১৩
শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	হাফসা খাতুন	১৫
প্রথম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	অভিপ্সা গোস্বামী	১৭
প্রথম পুরি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	অহনা কোলে	১৯
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	ড. রোহিদাস মণ্ডল	২০
দেবতা	অশোক শী	২২
প্রার্থনা	ড. তাপস কুমার মণ্ডল	২৩
একটি শিক্ষণ শিবিরের অভিজ্ঞতা	ড. তাপস কুমার মণ্ডল	২৪
আমারা পাঁচ জন	ড. তাপস কুমার মণ্ডল	২৬
ইসস	ড. তাপস কুমার মণ্ডল	২৮
হ্যাপি নিউ ইয়ার	সুপর্ণা মাহান্ত	২৯
হিমঝুরি	সুপর্ণা মাহান্ত	৩০
স্মৃতির পাতায়	আর্য্য হাজরা	৩১
বন্ধুর বন্ধুত্ব	সুতীর্থা হাজরা	৩৩
নিরুদ্দেশের স্বীকার	অঙ্কনা বিশ্বাস	৩৪
দ্যা রুল অফ লাইফ	সেখ শবনম	৩৫
প্রথম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	সুজতা পরামানিক	৩৬
শেষ কলেজ জীবন	পিয়াসা দাস	৩৭
বার্থ এ্যান্ড বুড়িয়্যাল	সেখ শবনম	৩৮
আমি সুদুরের পিয়াসী	অভিপ্সা গোস্বামী	২৯
দ্যা হাঙ্গার	সেখ শবনম	৪১
প্রকৃতিপ্রেমী রাধা	রিমা ঘোষ	৪২
মা	রূপসা পাঁজা	৪৩
ফেসবুক	গার্গী রায়	৪৪
উলের চাদর	সালেহার খাতুন	৪৫
আমার গ্রাম	স্বাতী মুখার্জ্জী	৪৭
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	বিধান সরেন	৪৮
পাখিদের দূরদেশে পাড়ি	সুপৃতি দত্ত	৪৯
আনএমপ্লয়মেন্ট	সৃজিতা যশ	৫১
নারী কথা	পিঙ্কী মাজি	৫২
সর্পদংশন	দেবস্মিতা সাঁই	৫৪
অপত্য স্নেহ	মৌমি মোদক	৫৫

মনে পড়ে

অধ্যপক ড.অমল কুমার ঘোষ
অধ্যক্ষ

মনে পড়ে -
শীত শেষের দখিনা হাওয়ায়
মাঘ ফাগুণে।
যখন বায়ু বয় সন্ধ্যায়
নীরব নিঝুম গাঁয়ে।
বসন্তে পাতার ঝরু ঝরু
যেন কানাকানি করে।
ফাগুনে যখন পলাশ কৃষ্ণচূড়ার
বনে রঙ লাগে –
সীমান্ত আধীরে রাঙে,
ভাঙের নেশায় ইটভাটির
কুলিরা যখন জ্যোস্নায়
মাদল বাজিয়ে গান গায়
মনে পড়ে।
মনে পড়ে –
তোমায় মনে পড়ে –
শালপাতা ওড়ানো অবেলায়।
ব্যাঙ ডাকে সাঁজে
সুর বাজে যেন
ঐকতান জালা যাচে যখন
মনে পড়ে।
জলভরা চারা ধানের ক্ষেতে
কাক শালিকের সিক্ত পাখায়
নিঝুম নিদাঘতপ্ত গ্রীষ্মে
কারা যেন তোমার গান
হায় আমার কানে –
ঘুঘু ডাকা দুপুরে।
বর্ষা আসে -

ডাহুকের চঞ্চল পদক্ষেপে।
ঝুপ ঝুপ করে যখন
বৃষ্টি পড়ে –
শান্ত হয় গাছপালা
বাঁশ বাগানের মাথায়
একাকী কাক ভেজে।
মনে পড়ে –
তবুও মনে পড়ে
উদাস মনে ক্লান্তি আসে।
শরৎ আসে ভোলাতে
কিন্তু শিউলির দোলনে
মন উত্তাল হয়ে ওঠে।
বাংলার বাউলিয়া যখন
মনে পড়ে –
হেমন্তে শুষ্ক পাতা পড়ে
স্মৃতির পাতা গজায়
সবুজে সুনীলে।
মনে পড়ে –
শীতের নরম বিছানায়।
উত্তরে হাওয়ায় ঠোঁট ফাটে
চৌচির হয় মন –
হিমেল হাওয়া
এ দেহ মন শান্ত করে না
স্মৃতির উত্তাপ
বিরাজে হৃদয়ে।
মনে পড়ে –

আমার হবে ?

পৃথা অধিকারী, তৃতীয় সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

তুমি কি আমার হবে ?
তোমায় কি আমার বুকের মাঝে,
আঁকড়ে রাখা যাবে ?
সকাল সাঝেঁ মনে তোমার স্মৃতি
যখন উঠবে ভেসে,
তখন কি তুমি নিজের মতো
জড়িয়ে ধরবে, আমায় ভালবেসে ?
পৌষ শেষের উদাস দুপুর
একলা বাউল মাতাল সুর,
তুলবে যখন একতারাতে
রাখবে কি হাত আমার হাতে ?
তুমি কি আমার হবে ?
ফাগুন রাতের পূর্ণিমাতে।
অলস নদীর স্রোতের সাথে
একলা মাঝি মেশাবে যখন ভাটিয়ালির সুর,
ভাসাবে কি তখন আমার সাথে
তোমার প্রেমের নৌকাখানি দূর-বহুদূর,
তুমি কি, আমার হবে ?
রাতের শহর স্তব্ধ যখন,
শীতের ছোঁয়ার লাগছে কাঁপন
তুমি তখন ঘুমে মগ্ন
আমি তখন চুপি সারে।
পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে নামব তোমার স্বপ্নপুরে,
বলবো হেসে রাজ্যে আমার, তুমি কি মোর রানী হবে ?
বলোনা, তুমি কি আমার হবে ?

জীবন

সান্তনা সরেণ
তৃতীয় বর্ষ/ বাংলা বিভাগ

জীবনটাকে তুমি যদি বড়ো করে তোলো
দেখবে তুমি সবার কাছে হয়ে গেছো ভালো।
ভদ্র ভাবে শিক্ষকদের মান্য যদি করো,
দেখবে তুমি সবার কাছে হয়ে গেছো বড়ো।
যদি তুমি পূর্ণ করো, মা বাবার আশা,
দেখবে তুমি সবার কাছে পাবে ভালোবাসা।
এভাবেই গড়ে উঠবে আদর্শ একজন,
দেখবে তুমি সত্যি পাবে সকলের মন।

শেষের সেদিন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ড. দেবব্রত গায়েন, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সালটা ১৯৪১। জীবনের শেষ দিনগুলোয় অসুখে ভুগছিলেন কবি। সারা জীবন চিকিৎসকের কাঁচি থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন, এবার বুঝি আর তা সম্ভব নয়। হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি চলছেই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কবি তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এরই মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। সেগুলো পড়ে দারুণ আনন্দ পেলেন কবি। বললেন, আরও লিখতে। অবন ঠাকুর রানী চন্দকে গল্প বলে যান, রানী চন্দ সে গল্প শুনে লিখে ফেলেন। তারই কিছু আবার দেওয়া হলো রবীন্দ্রনাথকে। তিনি পড়লেন, হাসলেন এবং কাঁদলেন। রানী চন্দ এই প্রথম এমন করে রবিঠাকুরের চোখ থেকে জল পড়তে দেখলেন।

রানী চন্দ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয়ভাজন, শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থী ও চিত্রশিল্পী এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব অনিল চন্দের স্ত্রী। চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের কথাই বললেন। রবীন্দ্রনাথের তাতে মত নেই। তিনি বললেন, ‘মানুষকে তো মরতেই হবে একদিন। একভাবে না একভাবে এই শরীরের শেষ হতে হবে তো, তা এমনি করেই হোক না শেষ। মিথ্যে এটাকে কাটাকুটি ছেঁড়াছেড়ি করার কি প্রয়োজন?’

কিন্তু যে যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন তিনি, তার উপশমের জন্য দেহে অস্ত্রোপচার করতেই হবে -এই হলো চিকিৎসকদের মত। আর সেটা করতে হলে শান্তিনিকেতনকে বিদায় জানিয়ে চলে আসতে হবে কলকাতায়। তাই শেষবারের মতো শান্তিনিকেতন ছাড়লেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৫শে জুলাই বেলা তিনটে ১৫ মিনিটে রবীন্দ্রনাথ এলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। খবরটা গোপন রাখায় স্টেশনে কিংবা বাড়িতে ভিড় ছিল না। পুরোনো বাড়ির দোতলায় ‘পাথরের ঘর’ -এ তিনি উঠলেন। স্ট্রেচারে করে দোতলায় নিতে হলো তাঁকে। ২৬শে জুলাই রবিঠাকুর ছিলেন প্রফুল্ল। ৮০ বছরের খুড়ো রবীন্দ্রনাথ আর ৭০ বছর বয়সী ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ অতীত দিনের নানা কথা স্মরণ করলেন। হাসলেন প্রাণখুলে। ২৭শে জুলাই সকালে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে বললেন একটি কবিতা, টুকে নিলেন রানী চন্দ।

কবিতাটির প্রথম কয়েকটি পঙক্তি হলো : ‘প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল সত্ত্বার নতুন আবির্ভাবে, কে তুমি, মেলেনি উত্তর।’ ৩০শে জুলাই ঠিক হয়েছিল তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার হবে। কিন্তু সেটা তাঁকে জানতে দেওয়া হয়নি। তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কবে অপারেশন হবে’। রথীন্দ্রনাথ বললেন, ‘কাল-পরশু’। আবার রানী চন্দকে ডাকলেন কবি, লিখতে বললেন : ‘তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/ বিচিত্র ছলনাজালে/হে ছলনাময়ী।’ ডা. ললিত এলেন একটু পরে। বললেন, ‘আজকের দিনটা ভালো আছে। আজই সেরে ফেলি, কী বলেন?’ হকচকিয়ে গেলেন কবি। বললেন, ‘আজই!’ তারপর বললেন, ‘তা ভালো। এ রকম হঠাৎ হয়ে যাওয়াই ভালো।’

বেলা ১১টায় স্ট্রেচারে করে অপারেশন-টেবিলে আনা হল কবিকে। লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে অপারেশন করা হচ্ছে। ১১টা ২০ মিনিটের দিকে শেষ হল অস্ত্রোপচার। ভারী আবহাওয়া উড়িয়ে দেওয়ার জন্য কবি রসিকতা করলেন, ‘খুব মজা, না?’ শরীরে যথেষ্ট যন্ত্রণা হয়েছিল অপারেশনের সময়। কিন্তু তা বুঝতে দেননি কবি। সেদিন ঘুমালেন। পরদিন ৩১শে জুলাই যন্ত্রণা বাড়ল। গায়ের তাপ বাড়ছে। নিঃসাড় হয়ে আছেন। ১লা আগস্ট কথা বলছেন না কবি। অল্প অল্প জল আর ফলের রস খাওয়ানো হচ্ছে তাঁকে। চিকিৎসকেরা শঙ্কিত। ২রা আগস্ট কিছু খেতে চাইলেন না, কিন্তু বললেন, ‘আহা! আমাকে জ্বালাসনে তোরা।’ তাতেই সবাই খুশী। ৩রা আগস্টও শরীরের কোনও উন্নতি নেই। ৪ঠা আগস্ট সকালে চার আউন্সের মতো কফি খেলেন। জ্বর বাড়ল।

৫ই আগস্ট ডা. নীলরতন সরকার বিধান রায়কে নিয়ে এলেন। রাতে স্যালাইন দেওয়া হল কবিকে। অক্সিজেন আনিয়ে রাখা হলো। ৬ই আগস্ট বাড়িতে উৎসুক মানুষের ভিড়। হেঁচকি উঠছিল কবির। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ডাকছিলেন, 'বাবা মশায়!' একটু সাড়া দিলেন কবি। রাত ১২টার দিকে আরও অবনতি হলো কবির শরীরের।

৭ই আগস্ট ছিল ২২শে শ্রাবণ। কবিকে সকাল নটার দিকে অক্সিজেন দেওয়া হলো। নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকল কবির। দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে তা একেবারে থেমে গেল।

কালাপাহাড় ও শিবিক্ষা মন্দিরঃ প্রসঙ্গ সুরথেশ্বর রাজার ইতিহাস

আনসার আলি, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে রাজা সুবাহু সিংহ রাজত্ব করতেন রাঢ়বঙ্গের বীরভূম অঞ্চলে। তাঁর রাজত্বের রাজধানীর নাম ছিল সুবাহুপুর। পরবর্তী কালে মানুষের মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে অঞ্চলের নাম হয় সুপুর। সুপুরের প্রাচীন আকর্ষণ এখানে মেন রাস্তার পরেই রয়েছে জোড়া শিব মন্দির। মন্দিরের দেওয়ালের চারপাশে/ উপরে বাংলার সাবেকি ঘরনার সর্বত্র টেরাকোটার কাজ চোখে পড়ে। এছাড়া রয়েছে আনন্দচাঁদ গোস্বামীর মন্দির, দুর্গামন্দির ও সুরথেশ্বর শিবমন্দির।

পুরাণ ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় রাজা সুরথ ছিলেন রাজা সুবাহুর পরবর্তী এক বংশধর। তিনি ছিলেন সমগ্র ভারতের একজন সম্রাট। সুশাসক ও যোদ্ধা হিসাবে তার খুব খ্যাতি ছিল। কিন্তু এক যুদ্ধে যবন জাতির কাছে তার পরাজয় ঘটে। সেই সুযোগে তার মন্ত্রী ও সভাসদরা তাঁর ধন সম্পদ ও সেনাবাহিনীর দখল নেয়। মনের দুঃখে তিনি মেধা ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন ও দেবী চণ্ডীর উপসনা করেন। পরে তিনি আশ্রয় নেন প্রাচীন সুপুরে। ভারতের পুরাণ এবং দেবদেবীর বিশেষ করে দেবী দুর্গার সাথে রাজা সুরথের নাম বিশেষভাবে যুক্ত রয়েছে। রাজা সুরথই প্রথম বাংলার দুর্গা বা চন্ডী পূজার প্রচলন করেছিলেন। আমরা বসন্তকালে যে বাসন্তী পূজা করে থাকি তা রাজা সুরথই প্রচলন করেছিলেন বলে জানা যায়।

পুরানের কাহিনী থেকে জানা যায়, রাজা সুরথ তখনকার গ্রামদেবী ভগবতী শিবিক্ষা (মা দূর্গা) কে তুষ্ট করার জন্য প্রায় একলক্ষ পশু বলি দিয়েছিলেন বলির রক্তেলাল হয়ে গিয়েছিল সুপুরের শিবিক্ষা মন্দির থেকে ডাঙ্গালি কালিতলা পর্যন্ত এই বলি থেকেই ডাঙ্গালি কালিতলা থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নাম হয়ে পড়ে বলিপুর। এই বোলিপুরই কালক্রমে হয়ে ওঠে বোলপুর। এই শিবিক্ষা মন্দিরের সম্মুখে ছিল দুটি পাথরের বাঘের মূর্তি। রাজা সুরথ ছিলেন একনিষ্ঠ শিবের উপাসক এই সুপুরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি শিবমন্দির এবং নামকরণ করেছিলেন সুরথেশ্বর শিবমন্দির। এই মন্দির ঘন অরন্যে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায় প্রায় ১০০ বছর পূর্বে গজোপতি নামে এক শৈব সাধু এই মন্দিরে উপস্থিত হয়ে জমিদার বংশের সহায়তায় নতুন করে সুরথেশ্বর মন্দিরের সংস্কার করেন।

ইতিহাস অনুসারে জানা যায়, কালাপাহাড় পূর্বে তিনি রাজীবলোচন রায় বা কালাচাঁদ রায় নামে হিন্দু ধর্মের মানুষ ছিলেন পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার স্বধর্মে ফেরার চেষ্টা করেন। কিন্তু বর্ণবাদী হিন্দু সমাজ তাকে ঘৃণাভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এতে তিনি প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রীশ্রী জগনাথ ধাম আক্রমন করেন ও মন্দিরের এবং বিগ্রহের প্রচুর ক্ষতিসাধন করেন।

এছাড়া কালাপাহাড় নাম ধারণ করে তিনি বাংলার মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন স্থানে প্রচুর মন্দির ও বিগ্রহ ভেঙ্গে ফেলেন সুপুর অঞ্চলে কয়েকটি হাত পা কাটা বিগ্রহ পাওয়া যায় অনুমান করা হয় কালাপাহাড় বীরভূম জেলার বোলপুর সংলগ্ন এলাকায় আক্রমণ করেন ও মন্দিরের ক্ষতি করেন।

আষাঢ় নবমীতে রাঢ়বঙ্গে শিবিক্ষা মাতৃকার পূজা হয় সুপুরের শিবিক্ষা মন্দিরে পূজা প্রচলিত আছে। শিবিক্ষা মন্দিরের সম্মুখে ছিল দুটি পাথরের বাঘের মূর্তি। মন্দির লাগোয়া একটি পুকুর রয়েছে। পুকুরটির নাম হয়েছে বাঘেলা পুকুর। এই পুকুরের জলও পবিত্র মনে করেন এলাকার সাধারন মানুষ।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

নাম হাফসা খাতুন

1st SEMSTER

ভূমিকাঃ- ভ্রমন মানে অচেনাকে চেনা, অজানাকে জানা, আর সেই ভ্রমন যদি হয় বন্ধুদের সঙ্গে থাকে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের নির্দেশনা ও সহচর্য তাহলে তো কোন কথাই নেই। দুই বছর আগে এমন একটা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার।

যাত্রাশুরুঃ- সালটা ২০২১ জানুয়ারী মাসের ৫ তারিখ, ভোর পাঁচটা সময় বিদ্যালয়ে এসে জড়ো হলাম নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। আমরা মানে নবম শ্রেনির ছত্রিশ জন এবং দশম শ্রেণির চল্লিশ জন এবং ৮ জন শিক্ষক। আমাদের আনন্দ তখন দেখে কে, পাখি যেন উড়তে শিখেছে। শিক্ষকেরা একে একে নাম ধরে বাসে ওঠালেন এবং সকাল ছয়টা সময় আমাদের বাস রওনা দিল মুর্শিদাবাদ এর উদ্দেশ্যে।

বাসের মধ্যে কিছু মুহূর্তঃ- বাসে সিট ছিল ৭০টি তাই সবাই সঠিক মতো বসতে পারেনি। আমার একটা বন্ধু বাসের মধ্যেখানে টুল নিয়ে বসে এবং বাসে ব্রেক দেওয়ায় সে টুল থেকে ছিটকে পড়ে যায়। তা দেখে বাস শুধু সবাই হা-হা করে হেঁসে ওঠে।

অতঃপর মুর্শিদাবাদঃ- আমাদের বাস ১১.৩০ মিনিটে মুর্শিদাবাদ-এ গিয়ে পৌঁছালো। আমরা সকলে বাস থেকে নামলাম। বাসের ডেক্স-এ থাকা রান্নার সরঞ্জাম দুজন স্যার নামিয়ে আনলেন। আমাদেরকে একটি ঘরের মধ্যে বসতে বলা হল এবং মিনিট ১৫ পরে স্যাররা আমাদের জন্য টিফিন আনলেন, তার মধ্যে ছিল একটি বাটার দেওয়া রুটি, ২টি লাড্ডু এবং একটি কলা। এরপর স্যাররা রান্না শুরু করলেন। আমরা বন্ধুরা মিলে কাছেই ঘোরাফেরা করছিলাম আবার কেউ কেউ বসেছিল। আমরা ঘরের বাইরে বেড়োবার জন্য ছটফট করছিলাম দেখে হেডস্যার আমাদেরকে বাইরে নিয়ে গেলেন, বাইরে গিয়ে দেখলাম কত মেলা বসেছে। বন্ধুরা অনেকে কেনাকাটা করতে শুরু করল, আমিও একটা কড়িরপুতুল সঙ্গে আরও অনেক কিছু কিনলাম। রান্না হয়ে গেছে, আমাদেরকে ডেকে নিয়ে গেলেন, আমরা হাত ধুয়ে খেতে বসলাম। শালপাতার প্লেটে খেতে দেওয়া হল। খাবারের মেনুতে ছিল - ভাত, মুগের ডাল, আলুপোস্ত, মাংস এবং পাঁপড়। খাওয়া-দাওয়া শেষে আমরা লাইন দিয়ে একপাশে এসে দাঁড়ালাম। স্যাররা ঠিক করলেন যে আমাদেরকে ঘোড়ার গাড়ি করে ঘুরতে নিয়ে যাবে। আটটি গাড়ি ঠিক করা হল। প্রত্যেক গাড়িতে ৯-১০ জন উঠল সঙ্গে একটি স্যার উঠলেন। তারপর গাড়ি ছাড়ল। আমাদের গাড়িতে ওঠেছিল আমার প্রিয় স্যার শান্তনু স্যার, তবে স্যারের সঙ্গে একটা মজার ঘটনা ঘটে, স্যার আমাকে ১ প্যাকেট পেয়ারা মাখা ধরতে দিয়েছে অমনি আমরা সবায় মিলে ভাগ করে খেয়ে নিই। গাড়ি চলতে আরম্ভ করে এবং কিছুক্ষন পরে পৌঁছালাম কাঠগোলা বাগান বাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমে লাইন দিয়ে আস্তে আস্তে সকলে এগিয়ে গেলাম। বাগানের ভিতরে আমি দেখলাম, পুকুর গাছপালা দিয়ে ঘেরা মন্দিরে মাইকেল এঞ্জোলো-র একটি মর্মর মূর্তি। বাগান বাড়ির সব কিছু দেখে আমরা রওনা দিলাম জাহানকোষ তোপখানার উদ্দেশ্যে। গাড়ি করে যেতে যেতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটি পুরানো ভাঙা বাড়ি। ঘোড়ার গাড়ি চালক কাকুকে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কার বাড়ি? উনি বললেন মিরজাফরের বাড়ি। উনার মুখ থেকে আরও নানা কথা শুনলাম। তবে যেটা দেখার জন্য মুর্শিদাবাদ যাওয়া সেটা হল হাজার দুয়ারীর সত্যই হাজারটি দরজা আছে কিনা। আমরা হাজার দুয়ারীর ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং নবাবী আমলের পুরানো জিনিস দেখে মুগ্ধ হলাম। এরপর গেলাম ঘড়িঘর দেখতে তবে ঘড়ি ঘরের ঘড়িটি ছিল অচল।

সিরাজদৌলার হাতের তৈরি কামানও দেখলাম। অদূরে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। তার তীরে রয়েছে সিরাজের সমাধি। এই গঙ্গা যেন ইতিহাসের একমাত্র সাক্ষী।

অন্যকথাঃ- দেখলাম অনেক, জানলাম অনেক অজানা। আর তার সঙ্গে অনুভব করলাম জীবনের এক অচেনা দিক। তবে বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, মজা করা, নতুন কিছু দেখার আনন্দ এসব সারাজীবনের সঞ্চয়। স্যারদের সঙ্গে গুরুগম্ভীর সম্পর্কটা যেন অনেক সহজ মনে হতে লাগল। সন্ধ্যা ৭ টা বাড়ির উদ্দেশ্যে বাস ছাড়ল এবং যতই বাড়ির কাছাকাছি আসতে লাগলাম ততই মন খারাপ করতে লাগল। হয়তো এই মন খারাপই আরও মধুর করে রাখে আমার এই মুর্শিদাবাদের স্মৃতি।

প্রথম ভ্রমনের অভিজ্ঞতা

অভিপ্সা গোস্বামী/পঞ্চম সেমেস্টার/বাংলা বিভাগ

ভূমিকাঃ- "বিশ্বভুবন আমারে ডেকেছে ভাই

চার দেওয়ালে গণ্ডি ছেড়ে এই তো ছুটে যাই।।"

মানুষ চিরকালে সুদুর পথের যাত্রী। তার রক্তে বাজে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদুরের পিয়াসী।" গৃহের মধ্যে মানুষকে বন্ধ করে রাখতে পারে না। দুর আকাশ, দুর বাতাস, দুর ভূবন হাতছানি দিয়ে ডাকে পিঞ্জনের পাখিকে। গৃহবন্ধ মানুষ ছটফট করে ঘরে বাইরে পা রাখার জন্য। কিন্তু পথ ডাকলেও অনেক সময় মানুষের কপালে জোটে না। কমনও বা পথের বন্ধু জোটে না। তবুও মানুষের মন বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশে।

হিমাচল প্রদেশ যাত্রাঃ- গত বছরের মে মাসে কলেজের গরমের ছুটি পড়লে আমরা সিমলা, কুলু, মানালী, পাঞ্জাব ও অমৃতসরে যাবার কথা ভাবলাম। আমরা আমাদের ব্যাগপত্র গুছিয়ে এবং চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে হাওড়ার থেকে মেল ধরে আমরা পৌছালাম কালকা। সেখান থেকে ট্রয় ট্রেন ধরে পৌঁছালাম সিমলা। সেখানে পৌঁছে রুমে আমারা আড্ডা দিই। সিমলার চারিপাশের নানারকম দৃশ্য দেখতে যাই। সিমলা থেকে ভোর পাঁচটা নাগাদ আমরা সেখানকার একটি ঘুরতে যাওয়ার বাসে করে ২৫০ কিলোমিটার পথ যাত্রা করি। এই বাসে করে যাওয়ার সময় আমরা চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে যাই এবং আমরা খুব আনন্দ করি বাসে করে অবশেষে পৌঁছালাম মানালী। মানালী থেকে পরদিন সকালে আমরা ঘুরতে বেড়য় অনেক জায়গা। তারমধ্যে সবচেরে ভালো লাগার জায়গা হল রোটাংপাস। সেখানে রাস্তা ও পাহাড় সমস্ত বরফে ঢাকা। এবং আমরা বরফের যাবার পোশাক পড়ে সেখানে গিয়ে অনেক খেলা, মজা করে সময় কাটাই। এই অনুভূতি কখনো ভুলতে পারবো না এবং এ-এক সুন্দর অভিজ্ঞতা। তারপর মানালী থেকে আমরা পাঞ্জাব যায়। পাঞ্জাবে গিয়ে আমরা অনেক আশেপাশের দৃশ্য দেখেছি। তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগার জায়গা হল হোয়াগা বোডার। ভারত ও পাকিস্তানে বোডার। আমরা ওখানে প্যারেড দেখি। এবং এক সুন্দর অভিজ্ঞতা হয় কখনো ভুলবো না। এর পর আমরা অমৃতসরে আসি। এবং অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির আমরা দর্শন করেছি। সেখানে পীর সাহেবের মূর্তি দেখি। ওখানকার পরিবেশ আমার খুব ভালো লাগে। তারপর এবার বাড়ি ফিরে আসার সময় হয়ে যায়। হিমাচল প্রদেশকে কেন্দ্র করে আমরা কয়েকটি জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এই পাহাড়ি অঞ্চলে অনেক অজানা পাহাড় ও নানান রকম ফুল ও নানান পরিবেশ আমাদের মুগ্ধ করে। দেশ কত বড়ো এর বৈচিত্র্য এবং নৈসর্গিক দৃশ্যবলি এবং সুন্দর তা না এলে

বুঝতে পারতাম না। কত অজানা মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। সমস্ত ছেড়ে আসতে আমাদের মনভারাক্রান্ত হয়ে যায়। ভ্রমন আমাদের মনকে সবরকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়। আমাদের মনকে উদার ও প্রশস্ত করে, ভ্রমন প্রতিদিনের তুচ্ছতা, শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দেয়। হিমাচল প্রদেশের ভ্রমনের স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় চিরকালে উজ্জ্বল হয়ে আছে ও থাকবে।

প্রথম পুরী ভ্রমনের অভিজ্ঞতা

অহনা কোলে, তৃতীয় বর্ষ / **বাংলা বিভাগ**

পুরী – আমার জীবনের প্রথম ভ্রমণ।

পুরী, ভারতের ওড়িশা রাজ্যের একটি ধর্মীয় এবং পর্যটন স্থান। সমুদ্রের ধারে অবস্থিত এই স্থানটি জগন্নাথ মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এই মন্দিরটি ভারতের চার ধামের মধ্যে একটি এবং হিন্দু ধর্মের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান।

পুরীর আকর্ষনীয় শুধুমাত্র জগন্নাথ মন্দিরের জন্য নয়, ওখানকার সমুদ্রসৈকতের জন্যও। তাছাড়াও রথযাত্রা এবং অন্যান্য ধর্মীয় স্থানগুলি পুরীকে একটি আকর্ষনীয় পর্যটন স্থান করে তুলেছে। আমরা স্বপরিবারে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে পুরী গিয়েছিলাম। পুরীতে নেমে আমরা প্রথম হোটেল খুঁজছিলাম। পুরীতে বিভিন্ন ধরনের হোটেল এবং লজ পাওয়া যায়, আমরা আমাদের বাজেট অনুযায়ী হোটেল বুক করে ছিলাম। হোটেলে ঢুকে আমরা প্রথমে কিছু খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছিলাম, সেখানকার খাবার ছিল খুবই সুস্বাদু এবং মশলাদার।

আমরা সকলে সকাল ন-টার দিকে সমুদ্রে সৈকতে গিয়েছিলাম, ওখানে গিয়ে আমরা সকলে খুব মজা করেছি, আমরা সকলে মিলে সমুদ্রে স্নান করেছি, ঢেউ খেয়েছি, পারে বসে ঝিনুক কুরিয়েছি। আমরা ফেরার পথে সকলে মিলে সামুদ্রিক মাছ, কাঁকড়া খেয়েছি। আমরা দু-টো নাগাদ হোটেলে ফিরে এসেছিলাম। হোটেলে ফিরে এসে আমরা সকলে মিলে দুপুরের খাবার খেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর বিকাল বেলা সকলে আমরা জগন্নাথ মন্দিরে গিয়েছিলাম। মন্দিরের ভিতরে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার মূর্তি দর্শন করেছি। সন্ধ্যা আরতি দেখেছি। আরতি দেখার পর আমরা কিছু খাওয়া দাওয়া করে হোটেলে ফিরলাম। পরের দিন সকালে আমরা সাক্ষী গোপাল মন্দির, লোকনাথ মন্দির এবং গুন্ডিচা মন্দির দর্শন করার জন্য বের হয়েছিলাম। তারপর আমরা সকলে হোটেলে ফিরে এসে নিজেদের জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলাম, ফিরে আসার জন্য। কিন্তু আমাদের আরো দু-টো দিন থাকার ইচ্ছা ছিল, তাও আমাদের ফিরে আসতে হল, পুরী হল খুবই সুন্দর জায়গা আর আমরা স্বপরিবারে গিয়ে খুবই মজা করেছি।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

ড. রোহিদাস মন্ডল, অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ

স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিময় সন্ধিক্ষণে

তুমি জন্ম নিলে বাংলা মায়ের ঘরে।

নিজেকে করলে সমর্পণ যুগান্তরের সংগ্রামী কর্মযজ্ঞে

আর সোনার বাংলার ইস্তেহারে।

বরণ করলে সশ্রম কারাদণ্ড

ব্রিটিশের অপশাসন আর নিষ্ঠুর অত্যাচারে।

পাড়ি দিলে ছদ্মবেশে আমেরিকা জার্মানি রাশিয়া।

তৈরি করলে শক্তিশালী ঐক্য মঞ্চ ব্রিটিশ শাসন অবসানে।

কাঁপিয়ে দিলে সাম্রাজ্যবাদী অহমিকা আর ব্রিটিশ দম্ভের ভিত।

শুধু অপশাসনের কলুষতা থেকে মুক্তি নয়,

আরো বৃহৎ কর্মযজ্ঞে নিজেকে করলে সমর্পণ।

গ্রহণ করলে মানব সেবার মহান ব্রত,

লক্ষ্য তোমার আত্মশক্তির উন্মোচন।

ব্রত করলে নারীর স্বাধীনতা,

শ্রমিকের মুক্তি, সাম্প্রদায়িকতার নিরসন,

সামাজিক সাম্য, সত্যের শক্তি, জাতপাতের উৎপাটন,

মৌলবাদের উচ্ছেদ, শুভশক্তির উন্মোচন,

লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

স্টাডি করলে সোশালিজিম, মার্কসবাদ, মানব তত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান।

যোগ দিলে...এশিয়াটিক সোসাইটি আর নৃতাত্বিক সমাজে।

স্থাপন করলে বিশ্বজুড়ে যোগসুত্র,

মানবের মুক্তি মন্ত্রে।

বন্ধু হল মাৎসিনি আর গ্যারিবল্ডি ইতালিতে।

যুক্ত হলে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্টএ রাশিয়াতে।

মন্ত্র পেল এম এন রায় আর বীরেন্দ্রনাথ আত্মশক্তির আন্দোলনে।

জোয়ার এলো সাম্যবাদে ভারতবর্ষের দিকে দিকে।

ঝাঁপিয়ে পড়লে কৃষক শ্রমিক সংগ্রামেতে বীর বিক্রমে।

কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত হও নি...

কলম ধরলে লিখতে বাংলার মিসিং হিস্ট্রি।

বদ্ধ করলে পুস্তকেতে-

স্বাধীনতা সংগ্রাম আর রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিবৃত্ত।

নৃতাত্বিক তত্ত্ব কথা আর বাংলার সামাজিক স্তরবিন্যাস।

তুমি বীর সমাজ বিপ্লবী স্বাধীনতার কান্ডারী।

তুমি বাংলার ইতিহাসে নতুন পথের দিশারি।

তুমি সত্যের পথিক, তুমি সংগ্রামের হাতিয়ার।

তোমাকে স্মরন করি বারে বারে, তোমায় করি নমস্কার !

‘দেবতা’

অশোক শী (করণিক)

দেবতা খুঁজি কত দেবালয়ে;
ফিরে ফিরে আসি নীড়ে,
সোনার দেউল পূণ্যভূমি,
শত তটিনীর তীরে।
পাই নাই দেখা খুঁজেছি সে কত;
রজনী যাপন করি।
সাগর, মোহনা, হিমালয়ভূমে
হিংলাজ পথে ঘুরি।
শুধু সে দেখেছি দেউল, মূর্তি,
দেবতা নাই গো সেথা।
বিধাতা সেথায় দেবভূমি গড়ে,
খুঁজিয়া ফেরে দেবতা।
তুমি যা হেরিছ দেবভূমি পরে,
যেথায়, তোমার দেবতা তুমি।
পূন্য কর্ম, মানবিকতা, অন্তরই দেবভূমি।
হাদয় দেউল প্রসারিত করো,
মনের মূর্তি গড়ে,
দেখিবে সেখায় বিরাজিছে দেব,
তোমারে দেখার তরে।
তীর্থে তীর্থে ভূমি সদা মোরা;
শত পূণ্যের লাগি,
হৃদয় তীর্থে হয় নাই যাওয়া
একক পূণ্য মাগি।
যবে মনে মনে মাখিবে অঙ্গে
সবাকার পদরেণু
দেখিবে সেদিন হৃদয় মাঝারে
বাজিছে শ্যামের বেণু।
অবশেষে ভাবি সাজাবো যতনে
মোর অন্তর ভূমি;
দেবতা হয়েই খুঁজিবো দেবতা
আদি দেবতারে নমি।

প্রার্থনা

সহকারী অধ্যাপক – তাপস কুমার মন্ডল

সফল হয় যেন আমার এই সাধনা,
মঙ্গল হোক সবার-করি এই কামনা।
এই প্রার্থনা অন্তরে করি আমি,
এমন শক্তি দাও ওগো অন্তর্যামী।।

শুভ ধারণ করি যা ধরম আমার,
ভালো আমি করি যা ধরম আমার।
আমার কর্ম হোক প্রাণের চেয়েও দামী,
এমন শক্তি দাও ওগো অন্তর্যামী।।

কটু কথা যেন মোর মুখে নাহি আসে।
অহম ভাব যেন মনে নাহি আসে।।
দেবত্ব বিকাশে সফল হই যেন আসি।
এমন শক্তি দাও অন্তর্যামী।।

মনকে নিজের মত যেতে দেব না,
মনকে নিজের বশে আনার কামনা।
অশান্ত মন যেন শান্ত করি আমি,
এমন শক্তি দাও ওগো অন্তর্যামী।।

“একটি শিক্ষণ শিবিরের অভিজ্ঞতা”

তাপস কুমার মন্ডল/সহকারী অধ্যাপক/গণিত বিভাগ

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের 54th All India Annual Youth Training Camp। স্থান - গঙ্গাধরপুর শিক্ষণ মন্দির B.Ed. College, হাওড়া। অনুষ্ঠিত হয়েছিল 25-30 December, 2022. প্রথমবার Annual Camp -এ যোগদান করলাম। এর আগে দু'বার সুযোগ হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতে পারিনি। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত ছাত্র-যুবকদের আগমন। গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও আরও কয়েকটি রাজ্য থেকে ছাত্র যুবকদের যোগদান। - Mini India

একটাই উদ্দেশ্য স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে ছাত্র যুবকদের চরিত্র গঠনের মাধ্যমে সুন্দরতর সমাজ গঠন ও ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতি সাধন।

25 শে ডিসেম্বর, বিকেল বেলা। মহামন্ডলের পতাকা উত্তোলন, সংঘগীতি, স্বদেশ মন্ত্র দিয়ে শিক্ষা শিবির শুরু হলো। সারি দিয়ে মাঠ থেকে অডিটোরিয়ামে যাওয়া, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীমৎ স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজের ভাষণ, অন্যান্য শ্রদ্ধেয় দাদাদের পরপর সংস্কৃত, ওড়িয়া, হিন্দী ও বাংলায় হৃদয় স্পর্শকারী ভাষণ দিয়ে শিক্ষণ থেকে শিবির দিব্যাস পুজী, হারিসট, হিন্দী ও বাংলায় ভতম হ্রদয় পরপর যাঃস্কৃত, সমাপ্তি। তার দিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। তার আগে সন্ধ্যায় সারিবদ্ধভাবে টিফিন খেতে যাওয়া, অনুভূতিই আলাদা। রাত্রের খাবার, নৈশ-শ্রবণ সবকিছুর মধ্যেই সময়ানুবর্তিতা দেখা গেলো। সংঘবদ্ধ জীবন দেখলাম। সাংগঠনিক কাজ দেখলাম। 1225 জন শিক্ষার্থী।

26 শে December, ভোর 4:45 -এ শয্যা ত্যাগ। অভ্যাস নেই, কিন্তু ওঠা গেলো। ভাই দাদারা সকলেই উঠেছে, আমি কেন পিছিয়ে পড়ব! Annual Camp -এ মনসংযোগ -এর class, সময় - 6:00 am to 6:55 am.। তিনটি ভাষাতে এই class - বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজীতে। 26 শে December থেকে 29 শে December বিভিন্ন বিষয়ে Training দেওয়া হলো - চরিত্র গঠন, জীবন গড়া, চরিত্রের গুণ ইত্যাদি, সঙ্গে Physical Training, Training class for Leader Traincess, Parate for ordinary Compers, Room discussion, special class, Question-Answer, বিকেলের দিকে বিভিন্ন খেলা ইত্যাদি।

শিবির অভিজ্ঞতার অনুষ্ঠানে কয়েকটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একজন ভাই ছত্রিশগড় থেকে এসেছিল। বলল – ‘মহামণ্ডলে আসায় আমি বেঁচে গেছি। আমাদের ওখানে প্রতি দু-একটি বাড়িতে দুষ্কৃতি দেখা দেয়, – criminal বন যাতা হ্যায়।’

একজন ভাই, সম্ভবত উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে এসেছিল। হয়ত senior দাদা শিবা তার কোনো sir -এর সঙ্গে এসেছিল প্রথমবার। প্রথম দিনের সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের শেষে সে তার senior কে বলে যে তার সেখানে আর ভালো লাগছে না, বাড়ি ফিরে যাবে। তাকে বাড়ি ফিরে না যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে সে ট্রেনে ফিরছে। হঠাৎ মনে পড়ে 25 শে December, শিবিরের Book Stall থেকে বই কিনেছিল, একটি বই ব্যাগ থেকে বের করে পড়তে শুরু করে। পড়তে পড়তে হঠাৎ বই -এর কোনো একটা অংশে থেমে যায়। পড়ে ও ভাবে – শিবিরে এসব সুন্দর জিনিসের Training দেওয়া হবে ? মনের পরিবর্তন হলো। সে নিশ্চিত হল – যেকোনো পরিস্থিতিতেই হোক এই Camp -এ আবার যোগদান করবে। তার senior কে ফোনে জানায় যে – আমি camp -এ আবার যেতে চাই, permission পাবো ? সে আবার camp -এ যোগদান করার অনুমতি পেল ও শেষ দিন পর্যন্ত training নিল।

সমমানুবর্তিতা বলতে গিয়ে একজন দাদা হিন্দীতে আলোচনা করেছিলেন। বলেন – “শ্রদ্ধেয় নবনী দা (প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, অখিল ভারত বিবেকানন্দ মহামণ্ডল) মহামণ্ডলের শিবিরের অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলনের জন্য এক chief Justice কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ঠিক সময়ের 5 মিনিট আগেও শিবির স্থলে পৌঁছতে পারেননি, তখন নবনী দা নিজেই মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে যখন দেখেন পতাকা উত্তোলনের সময় হয়ে এসেছে, ঠিক সময়ে পতাকা উত্তোলন করতে হবে। তখনও justice মহাশয় আসেন নি, নবনী দা নিজেই পূর্বনির্ধারিত সময়ে পতাকা উত্তোলন করে দেন। তার কিছুক্ষণ পরেই chief Justice মহাশয় মাঠে এসে পৌঁছান। এসে দেখে তো অবাক। নবনী দা সময়কে এমনই গুরুত্ব দিতেন।”

Be and Malle, মহামন্ডলের এইটাই Motto, নিজে ভালো মানুষ এবং অপরকে ভালো মানুষ হতে সাহায্য করবো স্বামী বিবেকানন্দ এটাই চেয়েছিলেন। এই ভাব নিয়েই মহামণ্ডলের কাজ।

30 শে December, camp- এর শেষদিন। সকালে র‍্যালি বের হবে। সাদা পোষাক নিয়ে গিয়েছিলেন, সারির প্রথম দিকে দাঁড়ালাম। গ্রামের ঢালাই রাস্তা দিয়ে র‍্যালি চলছে। সঙ্গে মহ্যমণ্ডলের বিভিন্ন ধ্বনি –

“মানুষ হয়ে একলা যখন, মানুষ হবই হব।
সব বাধাকে দূরে ঠেলে (মোরা) ভালোর দিকে যাব।” ইত্যাদি।

হঠাৎ শঙ্খধ্বনি। একজন গৃহবধূ বাড়ির বাইরে এসে র‍্যালির উদ্দেশ্যে, ঠাকুর-মা-স্বামীজীকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। মনটা কেমন হয়ে গেল। চোখ ভিজে গেল, নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। জল গড়িয়ে গেল। কী জানি, কেন এমন হলো। সারা র‍্যালি জুড়েই কয়েকবার এরকম ঘটনার পুনারাবৃত্তি হলো।

আমরা পাঁচজন

সহকারী অধ্যাপক – তাপস কুমার মণ্ডল

মুখ দিয়ে করি দেহ ঢাকার চেষ্টা,
কখনও বা মায়ের গায়ে লেপটে থাকি।
প্রথম যেদিন দেখতে পেলে –
দূর থেকে আদর, স্নেহের পরশ,
মিষ্টি হাসি দিলে।
কই, কোলে নিলে না তো!
কয়েকদিন পর, গুটি গুটি পায়ে –
কখনও বা জোরে।
তোমার পায়ের কাছে যাচ্ছি চলে –
খাবারের খোঁজে।
মা আমার নিশ্চিত,
এখনও হয়নি যে!
- 'মাগো, আসছি ফিরে,
সত্যি! খিদে পাইনি আমার।'
আর একটু বড় হয়ে,
বোনের তাড়া খেয়ে
ভাইয়ের দাঁতের কামড়
মায়ের বকুনি-
তোমার চোখের ভয়!
যদি তোমার ছেলের –
করে দি ক্ষতি!
চরম শীতে আছো কম্বলে,
মা বলে, জড় হ!
চটের বস্তা, খড় কুটো জোগাড় করে
ঘর করেছি তোদের জন্য।
আমি আছি বাইরে -
কীসের ভয়!

হঠাৎ এক সকাল বেলায়,
যাচ্ছি চেপে কোলে
তোমারই ছেলের।
মা ধরেছে পিছু –
বারান্দায় এনে, পা-পোস্ টেনে –
বসাল আমায়,
ধূলো লাগিয়ে জামায়।
সকালের মিষ্টি রোদ –
গায়ে মেখে, শুনতে পেলাম –
'মা, কিছু খেতে দাওনা!'
এখন আসি ভিতরে,
মা, গেটের ওপ্যারে।
মায়ের চোখে জল!
- 'মা, রইল তো চারজন,
আমি এখন হয়েছি আপনজন।'
পরদিন সকালে,
মা ঢুকেছে গেট ঠেলে –
পেছনে আছে তিন ভাই-বোন।
আমায় সামনে পেয়ে,
আনন্দে দেখে,
কাছে এসে, আদর করে,
বলল আমায় মা –
'বল্না ছেলেটাকে,
এদেরকেও নিতে।
জানিস, মন যে কেমন করে!
গতকাল রাতে,
প্রচন্ড শীতে, আর কাঁপুনিতে।
থাকতে না পেরে –
ছোটটা গেছে ছেড়ে।'

ইসস

সহকারী অধ্যাপক – তাপস কুমার মণ্ডল (গণিত বিভাগ)

বলছে মোদের অরুনাভ, -
গিয়ে কত কিছু খাবো!
যাচ্ছি বনভোজন ভাজনে।
রাইস হবে বে চিকেন হবে,
ফুলকপির রোস্ট হবে,
গিলে নেবো অর্ধেকটা –
শেষটা বাকি জনে।
সঙ্গে যাবে সাহিল,
খেলেই হবে কাহিল।
ওর ভাগেরটাও আহা –
চেটে-পুটে খাবো।
সায়নীও যাবে,
রোগা-টোগা চেহারা তার –
কতটাই বা খাবে!
ওর বাকিটাও আহা –
আমার পেটেই যাবে।
উঠল সে খুউব ভোরে,
চোখদুটো কচলিয়ে,
এদিক ওদিক চায়,
পেটে হাত বুলিয়ে।

HAPPY NEW YEAR

Suparna Mahanta/1st Semester/Dept. of English

Cold wind has started to blow
The streets illuminate to glow
Starts are twinkling in a row
Nothing stops in life to go.

The year is nocks reborn
Sun welcomes the morn
Wishes are all around
To shower love unbound.

Friends left forever
May not come ever!
Like the year passed
Leaving memories long last.

Let the dreams, have wings
That fly into hearts and sings
The song of your joy and success
I wish this year brings you happiness.

হিমঝুরি

সুপর্ণা মহান্ত/প্রথম সেমেস্টার/ইংরাজি বিভাগ

গাছটার নাম হিমঝুরি
বয়স হয়তো এক কুড়ি
মৃদু শীতল হেমন্তের আগমনে
শ্বেত শুভ্র সুগন্ধি ফুল ঝরে পড়ে।

আকাশে যেন মিষ্টি রোদের
বালুচুরি সাজে সাজানো কাদের
চোখের জলের অবিরত ঝরে পড়া
থামলো আজ প্রেমিকটির নিরন্তর লড়া,

ঝড়ে পড়া হিমশ্রীর মত
ঝড়ে পড়ল একটি প্রাণ।।

স্মৃতির পাতায়

আর্য্য হাজরা/পঞ্চম সেমেস্টার/বাংলা বিভাগ

প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা থাকে, আমাদের মনুষ্যজীবন অনেক বৈচিত্র্যময়। আড়ালে-আবডালে অনেক স্মৃতি আমাদের মানসপটে খেলা করে যায়, যার সব হিসাব আমরা রাখি না, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যা আমাদের মনকে নাড়া দিয়ে যায়, যা আমাদের স্মৃতির ক্যানভাসে আজীবন থেকে যায়, তাই তেমনি একটি ঘটনা আমার স্কুলজীবনে পড়ার সময় ঘটেছিল যার স্মৃতি আজও অমলিন আছে।

সালটা তখন ২০১৭, বছরের শেষে এবং বার্ষিক পরীক্ষাও শেষ। বয়স তখন নেহাতই অল্প, তখন আবেগ ভাসার সময়, পরীক্ষার শেষ হবার কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হল বেড়াতে যাবার। এমন কেউ নেই, যার মন বেড়ানোর কথা শুনলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না। স্বাভাবিক তখন আমার শিশুখনও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। এরপর আমার জন্য এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছিল তা আমি টেরই পাইনি। ঠিক হয়েছিল, মাসির বাড়ি দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হবে। বাবার অফিসের কাজের চাপ থাকায় অগত্যা আমি আর মা দুজনেই যাব, তাই স্থির হল, ঘটনার দিন, সকালে বাবা ট্রেকারে করে শক্তিগড় স্টেশনে ট্রেন ধরিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। ভয়ে বুক দুরুদুরু আমাদের দুজনেরই। প্রথমবার একা যাবার আনন্দ, ভয় সঙ্গে রোমাঞ্চ আমাকে এবং মাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। যথারীতি ট্রেন এসে পৌঁছাল, আমরা চাপলাম তাতে। কিছুক্ষণ পর গার্ডের হুইসেল দেওয়ার পরেই ট্রেন স্টেশন ছাড়তে শুরু করল। একে একে স্টেশন, বাড়ি-ঘর পিছনে ফেলে ট্রেন এগোতে শুরু করল। মাঝে অনেকক্ষণ পর নাম না জানা একটি স্টেশনে এক ভদ্রলোক আমাদের কামরায় উঠলেন, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধ। একজন অন্ধ মানুষ অনুভবে সবকিছু বোঝতে পারেন। সেইভাবে তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন, পাশে বসালেন। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন - কোথায় বাড়ি, কোথায় যাচ্ছি, কিসে পড়ি এইসব। আমি বললাম, আমার বাড়ি হটগোবিন্দপুর। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ওখানে যে কলেজ আছে, সেই কলেজে আমি SSC পরীক্ষা দিয়েছিলাম। খুব ভালো জায়গা। নিজের গ্রামের নাম শুনে খুব খুশি হলাম এবং এটাও পড়ে বুঝলাম উনি একজন শিক্ষক। ট্রেনে অনেকেই জিনিসপত্র বিক্রি করতে ওঠেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ তিনি এক ভদ্রলোক চাবির রিং বিক্রি করছিলেন। তাকে কাছে ডেকে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলেন কোনটা কিনবেন। কিন্তু ঠিক করতে পারায় আমার সাহায্য চাইলেন। আমি তো অবাক, আমার আগেই উনি রং বেছে নিয়ে আমাকে দেখাচ্ছিলেন কোনটা নেবেন। আমার বেশ কয়েকটা ভালো লাগায় আমি বললাম, যেটা ভালো হয় সেটাই নিয়ে নিতে। অবশেষে, উনি

নিজে একটি রং বেছে সেটাই কিনে নিলেন। তারপর আর খুব বেশিক্ষণ উনি থাকেননি কিছু কথা বলেই ওনার গন্তব্যস্থল এসে যাওয়ায় উনি নির্ভুলভাবে আমাকে আবারও অবাক করে দিয়ে নেমে যান। এবং আমার শিশুমনে একটা দাগ কেটে দিয়ে যান। ওনার সঙ্গে পরে আর দেখা হয়নি কোনোদিন, হলেও আমরা আর পরস্পরকে চিনতে পারব না, একজন ছোটো বাচ্ছার কাছে বন্ধু হয়েই স্মৃতিতে থেকে গেছেন। আমাদের কাছে সবকিছুই আছে তবুও আমাদের অনেক অভাব-অভিযোগ কিন্তু এনারা সত্যিই নিজেদের কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে শুধু অবাক করেন না বিস্মিতও করে তোলেন। তাই, আজ এতগুলো বছর পর ফিনিক্স পাখির ঘটনাটা উড়ে এসে বসল মনের এক জানালায়।

বন্ধুর বন্ধুত্ব

সুতীর্থা হাজরা/ পঞ্চম সেম/ ইংরেজি বিভাগ

হয়তো ভাবছেন হঠাৎ এই বিষয়টাই কেন লেখনীর জন্য বেছে নিলাম; কিন্তু কী করব বলুন তো... আমার জীবনে এটারই বড্ড অভাব। সেই ছোট্টবেলা থেকে আমি বন্ধু খুঁজেছি, এখনও অভাব। পরিবার বাদ দিলে আমি আপন কোনো বন্ধুর দেখা পাইনি। সবাই বলে, তারা বেড়াতে যায়, বাজারে যায়, মোবাইল ফোনে ঘণ্টার পর ঘন্টা কথা বলে, আর আমি ছুটি সিনেমা-সিরিজ দেখে, বই-টই পড়ে কাটাই। বলবেন তো এবার যে আমি কী কারোর সাথেই সম্পর্ক রাখি না? হ্যাঁ রাখি, ওই পড়াশোনার জন্য যতটুকু দরকার হয়, নোট পাঠানোর মধ্যেই সম্পর্কের ইতি। আসলে তাদেরও তো অনেক বন্ধু বুঝলেন কি না! তারা কি পাবে আমার জন্য সময়....। ছোটো থেকে আমারও অনেকগুলো তথাকথিত ‘বেস্টি’ ছিল, কিন্তু বড় হয়ে বুঝলাম তারা কেবল সুযোগসন্ধানী। হয়তো আমারও দোষ ছিল; বেশি আশা করে ফেলেছিলাম বুঝলেন! যাইহোক বন্ধুত্ব কী? যে সম্পর্ক দেয় খোলা আকাশের মতো স্বাধীনতা, হ্যাঁ কিন্তু ভুলবশত ভাববেন না যেন নারী স্বাধীনতার কথা বলছি; যে সম্পর্কের স্বচ্ছতা বিশুদ্ধ জলের থেকেও বেশি, যার গভীরতা বোধহয় মাপা যায় না, বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তম্ভ গড়ে ওঠে যে সম্পর্কের হাত ধরে তাই হয়তো বন্ধুত্ব। আমি কোনোদিন কারোর বন্ধু হয়নি, কেউ আমার না; তাও কোনো কোনো সময় অনুভব করেছি। বন্ধু কে? যারা বা যে মানুষ বা মানুষগুলো বন্ধুত্ব নামক সম্পর্কটাকে ঘিরে থাকে তারাই বন্ধু হয়। সমুদ্র যেমন আকাশের, পাহাড় যেমন ঝরনার আর স্রোত যেমন নদীর তেমন বন্ধু সবারই দরকার; আমারও। এই সম্পর্কটা সবথেকে সুন্দর বলেই আমার মনে হয়। আমি কাউকে দোষ দিচ্ছিনা যেমন, তেমন নিজেকেও সর্বান্তকরণে দোষী আমি ভাবতে পারব না। কেউ সেভাবে তার বন্ধুত্বের ছত্রছায়ায় আমায় রাখেনি তাই আমিও চেষ্টা করতে চাইনি। কিছু ক্ষেত্রে আমি বন্ধু ভাবলেও তারা স্বরূপ প্রকাশ করে আমাকে ভুল প্রমাণ করেছে। তবে আমিও হাল ছাড়িনি, ধ্রুবতারার মতো পথ চেয়ে আজও বসে আছি কোনো বন্ধুর আশায়।

আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হয়তো বর্তমানে অনেকের সাথেই কাকতালীয়ভাবে মিলে যাবে। কারন এটাই বর্তমান সময়ের সত্য, বন্ধু কেউ হতে পারে না; যারা পারে তারা সহজে আসে না। দিনের শেষে কথা বলার মতো কেউ থাকে না যাদের, তাদের দলে আমিও পড়ি। আমার মতো বন্ধুহারা মানুষেরা আজীবনই অপেক্ষায় থাকে। তবে, আমরাও বাঁচব আসল বন্ধুদের আসার স্বপ্ন নিয়ে।

নিরুদ্দেশের শিকার

অঙ্কনা বিশ্বাস/তৃতীয় সেমেস্টার/বাংলা বিভাগ

নিরুদেশ কথাটার অর্থ কোনো উদ্দেশ্যহীন ভাবে অজানার পথে পাড়ি জমানো। ঠিক এমনই একটা ঘটনা আমার পরিবারে ঘটে যায়। আমি চাঁদনী বাড়ির বড়ো মেয়ে। বাবা, মা, ভাইকে নিয়ে ছোটো পরিবার। মামা বাড়িতে অনেক পুরনো দালান বাড়ি, আমি আর ছোটো মামা বারান্দায় খুব খেলাধুলা করতাম কাঁনামাছি থেকে হৈ-হৈ দাপাদাপি করে সময় কাটতো আমাদের।

ছোটো মামা অনিরুদ্ধ আমার থেকে পাঁচ/ছয় বছরের বড়ো। ছোটো মামার খুব আদরের ভাগনী ছিলাম। আস্তে আস্তে বছরের পর বছর কাটতে লাগল সময় অনুযায়ী আমরাও বড়ো হয়ে যাই। ছোটোবেলার সেই খেলাগুলো আর হয় না। এখন মামা বাড়ি গেলেই মামার সাথে শুধু প্রেমের উপন্যাস নিয়ে তর্কবিতর্ক চলে। মামা উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার সময় যেন সবটা ওলটপালট হয়ে গেল দিদুন এর অকাল মৃত্যু কে কেন্দ্র করে। ছোটোমামা পরীক্ষা দেয় ভালো রেজাল্টও করে প্রতিবারের মতন।

এই ঘটনার পর থেকে শুরু হয় মামার মধ্যে আসল পরিবর্তন। মামা খুব অল্প ঘটনায় চিন্তিত হয়ে পড়তো। আর আগের মতন আমার সাথে কথাও বলতো না। কেমন যেন সবকিছুর থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করল। কলেজ শেষ করে মামা কাজের সূত্রে বাড়ি থেকে থেকে চলে গেলা অনেক দূরে। মামা বাড়িতে যখনই যেতাম ছোট মামাকে খুব একটা দেখতে পেতাম না, মামা ওই বাড়িটার মধ্যে থাকতে চাইতো না। সব সময় যেন কিছু খুঁজে চলেছে তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠতো। মামা তো আর স্বাভাবিক মানুষ নেই। বহুবার পরিবারে সবাইকে বলতে গেলেও আমাকে ছোটো ভেবে কেউ সে বিষয়ে গুরুত্ব দিত না।

দুর্গাপূজোর বিজয়া দশমীর দিন সেই ছোট মামা চাকরি করতে যাওয়ার নাম করে নিরুদ্দেশের যাত্রায় পাড়ি দেয়। গত চার বছর হয়ে গেল ছোটো মামা চাকরি করতে যাওয়ার নাম করে নিরুদ্দেশ। তার মুখে 'চাঁদ' ডাকটা আর শুনতে পাই না। বাড়ির লোকে ও তার নিরুদ্দেশে যাওয়ার কারন বা তার সাথে যোগাযোগ করতে পারে নি। পুলিশের কাছে গিয়ে বাবা, বড়ো মামা বহুবার খোঁজ করেছে ডায়রি করেছে কিন্তু ছোটো মামার আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

ছোট মামা কেন এভাবে হারিয়ে গেল আজও আমাদের প্রত্যেককে ভাবিয়ে চলেছে। প্রতিনিয়ত এই হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলো যাচ্ছে কোথায় তারা হারিয়েই বা যায় কেন??

THE RULE OF LIFE

Shaik Shabnam/5th Semester/Dept of English

Life is full and clear,
When you chant with cheer.
But it feels so hollow,
When your heart turns shallow.

When you hear the ring,
May the real life begin.
If you stand apart,
You'll never see the chart

Unless your talent is shaped and moulded
You'll never be the gold, unfolded.
If you dream to be receiver,
First, you must rise as an achiever.

প্রথম ভ্রমনের অভিজ্ঞতা

সুজাতা প্রামাণিক/পঞ্চম সেমেস্টার/বাংলা বিভাগ

দূরে দূরে নীল আকাশ,
সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের রোল
বালি সৈকত, সূর্যের আলো
সব মিলে গেছে ভ্রমণের গল্প।

দীঘা আমার প্রথম ভ্রমন। আমার জীবনের প্রথম ভ্রমণ আজও সজীব। সেই সময় আমার বয়স ছিল ১০ বছর। আমার বাবা-মা, জেঠু-জেঠিমা, দাদা-দিদি এদের সাথে আমি গিয়েছিলাম দীঘায়। সেই সময় দীঘা ছিল একটি সমুদ্র তীরবর্তী শহর। কিন্তু আমার কাছে সেই ছোট্ট সমুদ্র তীরবর্তী শহরটি বিস্ময়ের জগৎ। তখন সালটি ছিল ইং-২০১৪ ডিসেম্বর ১৮ তারিখ বৃহঃস্পতিবার সকালে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে করে আমরা সবাই দীঘা যাত্রা শুরু করি। ট্রেনের জালালা দিয়ে আমি বাইরের দৃশ্যটি দেখতে থাকি। সবুজ ক্ষেত, নদী-নালা, গাছপালা সবকিছু আমার কাছে নতুন ছিল। এই সমস্ত দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল দীঘায় পৌঁছে যাই। দীঘায় পৌঁছে আমরা প্রথমে ছোট্ট হোটেলে থাকি। হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা সমুদ্র সৈকতের দিকে যায়। সমুদ্রের বিশালতা আমাকে মুগ্ধ করে তোলে। আমি প্রথমবার সমুদ্রের জল ছুঁয়ে দেখি। তার ঠান্ডা স্পর্শ আমার মনে আজও রয়েছে। আমরা সবাই সমুদ্রের ধারে বসে বালু খেলি, ঢেউয়ের সাথে খেলি এবং ছোটো বড়ো কিছু ঝিনুকগুলি আমি নিজের কাছে সংগ্রহ করে রাখি। সমুদ্রের তীর থেকে আমরা হোটেলে ফেরার পথে একটি দোকানে কিছু সামুদ্রিক মাছ ভাজা বিক্রি হচ্ছে দেখতে পাই। সেখানে গিয়ে আমরা মাছ ভাজা কিনে খায়। তারপর ফিরে যাই হোটেলে। ফের বিকালে সবাই মিলে আসি সমুদ্রসৈকতে, তারপর সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে বসে সুর্যাস্ত দেখি। সেই সূর্যাস্তের রঙীন আকাশ আমার মনে চিরতরে রয়ে গেছে। দীঘায় গিয়ে আমরা আরও অনেক জায়গা ঘুরে দেখি। আমরা গিয়েছিলাম পুরাতন দীঘা, সামুদ্রিক জীবজন্তুর জাদুঘর সব আমার কাছে নতুন ছিল। সবকিছু আমাকে আনন্দ দিয়ে ছিল। আমার প্রথম ভ্রমণের স্মৃতি আজও আমার মনের কোনে জ্বল জ্বল করে। সেই সব অনুভূতি আমার মনে সঞ্চিত রয়েছে। দীঘা আমার কাছে শুধু একটি ভ্রমনের স্থান নয়, সে আমার স্মৃতির একটি অবিস্মরণীয় অংশ।

শেষ কলেজ জীবন

পিয়াসা দাস (তৃতীয় বর্ষ)

আমি একজন কলেজ ছাত্রী। সালটা ছিল 2022। 2022 সালের 23 সেপ্টেম্বর আমার কলেজ জীবনের প্রথম পদার্পণ। কিছুটা ভয়, জড়তাকে সঙ্গী করে সেদিন প্রথম কলেজ প্রবেশ করেছিলাম। অচেনা পরিবেশ, অচেনা ক্লাসরুম, নতুন বন্ধু, নতুন অভিজ্ঞতা সবকিছুই মনে হয় এতো নতুন এতো রোমাঞ্চকর। প্রথম প্রথম সবাই যেমন কলেজ নিয়ে উচ্ছ্বাসিত থাকে, আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। কলেজটা যেন অদৃশ্য মায়ার জালে আমায় আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে। জীবনের সোনাঝরা দিনগুলি যেমন সব শীতের পাতার মতো ঝরে যায় দেখতে দেখতে কলেজ জীবনটাও ঠিক তেমনি শেষ হয়ে আসবে। কলেজটা ছেড়ে চলে যাবো ভাবতেই মনের গহীনে যেন চিন চিন করে ওঠে। ভাবতেই পারছিলাম না আর কিছুদিন পর ছাত্র জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় অধ্যায়টারও ইতি ঘটবে। বন্ধুদের সাথে ক্যামপাসে ঠাঁটা, আড্ডা দেওয়া, খুনসুটি-সবকিছুই স্মৃতি হয়ে রয়ে যাবে মনের মণিকোটায়। ভাবতে বড়ই কষ্ট হয়। কিন্তু নিয়তির টানে থেমে থাকবে না আমাদের জীবন। হয়ত একদিন আমিও প্রতিষ্ঠিত হব। আমার জন্য পৃথিবী তার চলার গতি বদলাবে না। সে তার নিজের গতিতেই চলবে। ঠিক যেমনই ক্লাস হবে আগের মতোই। আবারও আরেকটি ব্যাচের আগমন ঘটবে এবং নিয়ম মত তারাও বিদায় নিবে। এই যে এখনও ক্লাসরুমেই বসে আছি। কিন্তু আজ আর নতুন কিছু শেখার আগ্রহ নেই, শুধুই মনে পড়তে মনে পড়ছে পুরনো দিনগুলোর কথা। আর কিছুদিন পর এভাবে সারাদিন সবাই একসাথে ক্যাম্পাসে সময় কাটাবো না। নতুন জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কলেজ জীবন যতই শেষ হয়ে আসুক না কেন, এর স্মৃতিগুলো সারাজীবন মনে থাকবে। এই সময়টা শিখিয়েছে আমাকে স্বাধীনতা, বন্ধুত্ব এবং জীবনের প্রতি মুখোমুখি হওয়ার শক্তি।

ভালো থাকুক আমার সমস্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমস্ত সহপাঠীরা।

BIRTH AND BURIAL

Shaikh Shabnam/Semester-V/Dept of English

The very first letter is same,
For life and loss, a fleeting flame.
Each breathe we take, a fleeting thread,
Each step we walk, a path to dead.

The roads diverse, yet all align,
To end beneath the final sign.
No crown nor coin can change the fate,
The silent door where all must wait.

In life, we search, we strive, we yearn,
Yet all to dust we must return.
The laughter fades, the echoes still,
The clock runs out, despite our will.

But in the end what do we find?
A peace that quiets stormy mind.
The very first letter is same,
For death and life, this endless game.

-: আমি সুদূরের পিয়াসী :-

অভিপ্সা গোস্বামী ৫ম বর্ষ / বাংলা বিভাগ

"বিশ্বভূবন আমারে ডেকেছে ভাই
চার দেওয়ালের গণ্ডি ছেড়ে তাই তো ছুটে যাই।"
অভিপ্সা গোস্বামী/পঞ্চম সেমেস্টার/বাংলা বিভাগ

মানুষ চিরকাল সুদূর পথের যাত্রী। তার রক্তে বাজে রবীন্দ্রনাথের শব্দ "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" গৃহের মধ্যে মানুষকে বন্ধ করে রাখতে পারে না। দুর আকাশ, দুর বাতাস, দূর ভুবন হাতছানি দিয়ে ডাকে পিঞ্জরের পাখিকে। গৃহবদ্ধ মানুষেও ছটফট করে ঘরে বাইরে পা রাখার জন্য। কিন্তু পথ ডাকলেও অনেক সময় পথের বন্ধু জোটে না। তবুও মন বেরিয়ে পরে নিরুদ্দেশে।

সাত বছর মে মাসে কলেজের গরমের ছুটি পড়তে পড়তেই আমরা স্বপরিবারে ভ্রমনে বের হলাম। আমরা সিমলা, কুলু, মানালী; পাঞ্জাব ও অমৃতসরে যাবার প্রোগ্রাম করলাম। আমরা আমাদের ব্যাগপত্র গুছিয়ে এবং চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে হাওড়া থেকে মেল ধরে পৌঁছালাম কালকা। সেখান থেকে টয় ট্রেন করে পৌঁছালাম সিমলা। সিমলাতে গিয়ে আমরা সিমলার চারিদিক ভ্রমন করে দেখি। সিমলার জাখু পাহাড়ে জাখু মন্দিরটি অবস্থিত। এর মধ্যে অন্যতম হল শ্রী হনুমান মূর্তি যার উচ্চতা ১০৮ ফুট। এটি সিমলার সবচেয়ে উচ্চতম মূর্তি। যা সিমলার যেকোনো প্রান্ত থেকে দেখা যায়। এছাড়াও আশেপাশের নানান দৃশ্য দেখতে যাই। সিমলা থেকে ভোর পাঁচটা নাগাদ আমরা সেখানকার একটি টুরিষ্ট বাসে করে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার পথ যাত্রা করি। সেই বাসে যাওয়ার সময় আমরা চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে যাই। তারপর অবশেষে রাত নয়টা নাগাদ আমরা মানালীর হোটেলে পৌঁছায়। তারপর দিন সকালে আমরা মানালীর আশেপাশের নানান জায়গায় যাই তার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগার জায়গা ছিল রোটাংপাস। সেখানের পাহাড়, রাস্তা ও পাছপালা সবই বরফে ঢাকা এবং আমরা বরফের মধ্যে যাওয়ার পোশাক পরে বরফে গিয়ে সারাদিন খেলা করি। এই যে বরফের মধ্যে খেলার আনন্দ আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না এবং এ-এক সুন্দর অভিজ্ঞতা। এরপর মানালী থেকে আমরা ডালহৌসি, খাজিয়ায় এবং ধর্মশালা প্রভৃতি জায়গা ঘুরে অবশেষে পাঞ্জাব পৌঁছায়। এবং সেখানে গিয়ে আমার মন এক সুন্দর জিনিস দেখে মুগ্ধ হয়ে

যায়। তা হল ওয়াগা বর্ডার। এটি ভারত ও পাকিস্তানের বর্ডার। যেটি পাঞ্জাবে অবস্থিত। এবং বর্ডারে গিয়ে সেখানে প্যারেড ও নানারকম দেশাত্মবোধক গান ও নাচ দেখে আমার মন প্রসারিত হয়ে যাই ও মেলেটারী জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে যাই। এই বর্ডারের চিত্র আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না। যদি আবার ভাগ্য হয় সেখানে যাবার চেষ্টা করবো। তারপর আমরা পাঞ্জাবের একটা হোটেলে গিয়ে পৌঁছায়। তারপর ছিন সকালে আমরা অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির দর্শন করতে যাই। এই মন্দিরটি চতুর্থ শিস গুরু শ্রী রাম দাস প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের চূড়াটা পুরো সোনায় মোড়া। এই মন্দিরে সমস্ত জাতি ও বর্ণের মানুষ প্রবেশ করতে পারে। মন্দিরের ভিতরে পীর সাহেবের সমাধি রয়েছে। এর চারপাশের পরিবেশ খুবই মনোরম। তারপর আমরা আরও আশেপাশের জায়গা দেখি। স্বর্ণমন্দিরের এত মনোরম পরিবেশ ও তার সৌন্দর্য দেখার জন্য আবার আমরা সন্ধ্যাবেলায় যাই। স্বর্ণ- মন্দিরের সামনে একটি মুকুর আছে। তাতে স্বর্ণমন্দিরের প্রতিচ্ছবি দেখা যাই এবং ওই সোনালী রং ওই আলোয় এত সুন্দর দেখায় যে ভাষায় বলে বোঝানো যায় না। এরপর সেখান থেকে আমরা বাড়ির দিকে যাত্রা করি একরাশ স্মৃতি ও মনভরা দুঃখ নিয়ে।

হিমাচল প্রদেশকে কেন্দ্র করে আমরা বেশ কয়েকটি জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এই পাহাড়ি অঞ্চল, অজানা পরিবেশ এবং নানান রকমের ফুল ও পাখি আমাদের মুগ্ধ করল। আমাদের দেশ কত বড়ো, কত এর বৈচিত্র্য এবং নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি কত সুন্দর তা এখানে না এলে আমরা বুঝতে পারতাম না। এই পরিবেশ ও অজানা মানুষদের সঙ্গ ও সাহচর্য আমাদের মনকে সবরকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্তিক্তি দেয়। আমাদের মনকে উজার ও প্রশস্ত করে। ভ্রমন প্রতিছিলের তৃচ্ছতা, শুধু দিনযাপনের শুধু সান ধারনের গ্লানি থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দেয়। হিমাচল প্রদেশ ভ্রমনের স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং থাকবেও।

THE HUNGER

Shaikh Shabnam/Semester – V/Dept of English

Beneath the weight of the sky so wide,
In the shadows deep, where hopes abide,
A child with eyes of hollowed hue,
Dreams of books he'll never view.

The Hunger gnaws, a beast unseen,
A silent cry, a muted scream.
He trades his youth for scraps and toil,
While wisdom waits in distant soil.

A Teacher's voice a distant bell,
A tale of future it could tell.
But here, the price of bread prevails,
And knowledge fades, its promise fails.

A child once bright with eager flame,
Now learns the rules of hunger's game
The chalkboard waits, a silent plea,
The hands held back by poverty.

The streets are schools where lesson bite,
Of struggle's depth, and endless night.
The wealthy feast, the rich grow bold,
Yet wisdom straves in the young and old.

For every child, a desk a pen,
A hope to live, to dream again.
The dreadful tool of greed must cease,
To give the needy their rightful peace.

So raise the lamp, let knowledge shine,
For every soul, a chance divine.
No child should bear the weight alone,
Education is their rightful throne.

প্রকৃতিপ্রেমী রাধা

রিমা ঘোষ/পঞ্চম সেমেস্টার/বাংলা বিভাগ

প্রকৃতির সঙ্গে যে কথা বলা যায় একথা আমরা যেন বিশ্বাসই করতে পারি না। আমরা ভাবি প্রকৃতি আবার কথা বলতে পারে নাকি ? এও কী সম্ভব?

তবে ভালোবেসে সবই সম্ভব এই কথা বিশ্বাস করত রাধা। রাধা এক বাচ্চা মেয়ে, বয়স তেরো-চৌদ্দ হবে। স্কুলে পড়াশুনা করত। সবাই ওকে পাগল ভাবত। ভাবত মেয়েটার মাথা হয়ত খারাপ, কী সব আপন মনে বকেই যায়। রাধার কোনো বন্ধু ছিল না, তাই সে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিল পাখি, পশু, ফুল, গাছ, প্রজাপতিদের। রাধা সারাদিন বনে প্রকৃতির কোলেই বসে থাকত। সবাই ওকে পাগল ভাবলেও গ্রামের একজন ছিল সে ভাবত না। সে তার সঙ্গে প্রকৃতির কোলেই খেলা করতে আসত। রাধার মন খারাপ হলে তার সঙ্গী ছিল সে। তার নাম পলাশ, রাধা প্রকৃতিপ্রেমী আর তাছাড়া তার আরও একটি গুণ ছিল সে খুব ভালো গান বারতে পারত। তার গান শেখা প্রকৃতির কোলেই।

রাধার বাড়িতে থাকত তার সৎ মা আর সৎ ভাই। তারা কেউই রাধাকে সহ্য করতে পারত না। তারা খুব দরিদ্র ছিল। তাদের সংসার চলত না বলেই বলা যায়। রাধার সৎ মা দেখল রাধার গান সবাই পছন্দ করে। মানুষ তার স্বার্থের জন্য সব করতে পারে। সৎ মা ঠিক করলা রাধার গান বিক্রি করে সে তার সংসার চালাবে। রাধাকে দিয়ে গান গাওয়াতো এবং সেই পয়সায় তাদের সংসার চলত।

ধীরে ধীরে তার সৎ মা আরও লোভী হয়ে উঠলেন। তিনি পয়সার জন্য রাধাকেও বিক্রি করার কথা ভাবলেন। রাধার বয়স তখন আঠারো। সেই অন্ধকার রাতে যখন রাধার সৎ মা এক বড়ো ব্যাবসায়ীর হাতে তাকে তুলে দিচ্ছিল তখন সেই সময় তাকে রক্ষা করল এই প্রকৃতি। নৌকায় যাওয়ার সময় প্রবল জোয়ারে নৌকা ডুবে গেল, রাধা ভাসতে ভাসতে এক তীরে এসে পৌঁছলো, সেই অন্ধকার রাত্রি রাধার জীবনে এক নতুন সকাল নিয়ে এল।

সেই তীরেতে তার বন্ধু পলাশ প্রতিদিন স্নান করতে আসত। পলাশের হাত ধরেই তার গানের জীবনের নতুন এক দিক আরাম্ভ হল।

আজ তিন বছর পর রাধা গ্রামে আসছে তার বন্ধু পলাশের সাথে দেখা করতে। সে আজ বড়ো গায়িকা হয়েছে। যে গ্রামের লোকেরা তাকে পাগল বলত, আজ সেই গ্রামের বাচ্চাদের গানের স্কুলের শিক্ষিকা রাধা।

কোনো কিছুর প্রতি নিষ্ঠা ও সততা একদিন সফল করবেই তাকে। তাই প্রকৃতিপ্রেমী রাধা আজ সফল। প্রকৃতি ও গানের প্রতি ভালোবাসায় তাকে আজ বড়ো গায়িকা করে তুলেছে।

মা

রূপসা পাঁজা/পঞ্চম সেম/ বাংলা বিভাগ

‘মা’ ছোটো একটি শব্দ, অথচ কর্তব্য, দায়িত্ব, মানবতা সকল দিক থেকেই যেন সর্বশ্রেষ্ঠ আসনের আধিকারী সন্তান সর্বপ্রথম মাতৃগর্ভেই জন্ম নেয়, সেখানেই প্রাণ পায়, ধীরে ধীরে পরিণত মানুষ হয়। ১০ মাস ১০ দিন মাতৃগর্ভে শিশুটি অবস্থান করে, তখন সে অন্ধকারে নির্ভৃত থাকে। মা-ই প্রথম তাকে ভূমিষ্ট করে, তাকে আলোর পথ দেখায়। তরপর শুরু হয় তার বেড়ে ওঠার পালা। মা নিজের সমস্ত কামনা-বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে তৈরী করতে থাকে নিজের সন্তানকে। তাকে নিজের মতো করে, নিজের পাওয়া-না-পাওয়াগুলোকে তার সন্তানের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করে এই আশায় যে, তিনি যাকে নিজের সমস্তটুকু দিয়ে যে মানুষ করে তুলেছেন তাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে পারবেন, ভবিষ্যৎ-ত্র সে তার লাঠি হবে।

মায়েরা প্রত্যেকদিন প্রত্যেক মুহূর্তে সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সয়ে যায় সমস্ত লাঞ্ছনা-বঞ্চনা- অত্যাচার-ক্ষিদের জ্বালা, যেন তার সন্তান দু-বেলা পেট ভরে খেতে পায়। মা তার গত বছরের কেনা নিজের ছেঁড়া শাড়িটা তালি দিয়ে পরে অথচ ছেলেকে নিত্যনতুন পোশাক পরায়, যাতে তার মাথা হেঁট না হয়, যাতে তার বন্ধুবান্ধব তাকে ঘৃণা না করে, সারাদিন সাংসারে অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও রাতে বিছানায় তার খোকাকে ঘুম পাড়ায়। নিজের চোখের জল লুকিয়ে ছেলের মুখে হাসি ফোটায়। যার জন্য এতকিছু করা, সেই ছেলে একদিন বড়ো হয়ে, নিজের সংসারের দায়িত্ব নেয়, কিন্তু যে মা তার জন্য সারাজীবন শুধু দিয়েই গেছেন বৃদ্ধবয়সে ছেলের ভালোবাসা আর আশ্রয় ছাড়া কিছুই প্রত্যাশা করেননি তাঁরই দারিত্ব নেওয়ার সময় পায়না। নিজে এসি ঘরে শোয়, এসি গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়ায়, দামি Brand –এর প্যান্টশার্ট পরে, ছেলেকে এক নামি স্কুলে ভর্তিও করে, কিন্তু যার দামে এইসব Luxary প্রাসাদের মতো বাড়ির সবচেয়ে ছোট্টো ঘরটাতেও তার জায়গা হয় না, তার ঘরে ফ্যান-লাইট দেওয়া নাকি বাজে খরচ, তাই এই বাজে খরচ জোগাবার সামর্থ্য তার ছেলের থাকে না। অবশেষে মায়ের ঠাঁই হল ‘বৃদ্ধাশ্রম’।

এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম, আধপেটা খেয়ে বা উপবাস করে নিজের ছেলেকে মানুষ করে তোলার প্রয়াস ... এই সবকিছুর মর্যাদা তিনি কি পান? তার সন্তান বড়ো হয়, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তাকে মানুষ কি বলা চলে ? মা তার সন্তানের জন্য শেষনিঃশ্বাস অবধি ভগবানের কাছে মঙ্গল কামনা করে অথচ সেই ছেলেই মায়ের বৃদ্ধ বয়সে দারিত্ব নিতে অস্বীকার করে, এই স্নেহের সন্তানই মায়ের মৃত্যুর পর মুখাগ্নি করার সময়টুকুও পাননা, কারন – মা সেই মুহূর্তে তার কাছে ততটা প্রয়োজনীয় নয়।

ফেসবুক

গার্গী রায়/প্রথম সেমেস্টার/ইংরাজি বিভাগ

মার্ক জুকারবার্গের দ্বারা নির্মিত এই ফেসবুক
কত হারিয়ে গেছে নববর্ষে পরিচিত হওয়া শত শত মুখ।।
এখানে যে যার মতো যায় আসে,
বিপদে থাকেনা পাশে
তবে সবাই সবাইকে ‘বন্ধু’ বলে ডাকে,
কিন্তু সেই বন্ধু শব্দের অর্থ কজনই বা বোঝে?
হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যায় চেনা মুখগুলো,
মাঝে মাঝে ভাবি তারা কি আপন ছিলো।।
এখানে কেউ রাখে না কারোর খোঁজ।
তবুও প্রত্যেকে সম্পর্ক গড়ে তোলে রোজ
কিছু মানুষ উপকৃত হচ্ছে এই ফেসবুক থেকে,
আবার কিছু মানুষ প্রতারিত হচ্ছে ফেসবুকে ‘ঠগ’ মানুষের থেকে।।
ফেসবুক নাকি বিশ্বটাকে
হাতের মুঠোয় এনেছে এখন,
আর সেই ফেসবুকেই
সবচেয়ে বেশি ভাঙছে মানুষের মন।।

উলের চাদর

সালেহার খাতুন / পঞ্চম সেমেস্টার / বাংলা বিভাগ

আমাদের বাড়িটা ছিল গ্রামের শেষ প্রান্তে মাঠের ধারে। এইদিক টায় খুব বেশি বাড়ি নেই। অনেকটা দূরে দূরে দু-একটা বাড়ি আছে। সবই কাঁচা বাড়ি, খড় দিয়ে ছাওয়া। তবে আমাদের বাড়িটা টালি দিয়ে ছাওয়া ছিল। আমাদের বাড়ির পূর্বদিকে তিন-চার হাত দূরেই ছিল একটা তালগাছ। আর উত্তরপূর্ব কোন করে ছিল বড়ো একটা বাঁশ বাগান। সেখানে ছিল যত রাজ্যের বকের বাসা। অনেকদিন রাতে ঘুম ভেঙে গেলে শুনেছি বন্ধের ডাক। রাতে তাদের ডাক খুবই ভয়ানক হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন একদল শিশু কাঁদছে। গ্রীষ্মের দিনে অনেক রাত পর্যন্ত পাড়ার অনেকেই বাড়ির বাইরে মাঠে বসে হাওয়া খেত। আমরা ছোটোরা আকাশে তারা দেখতাম। খুবই সুন্দর লাগত। তরে শীতের দিনে-সন্ধে সাতটার পরেই সব নিঝঝুম। শুধু থেকে থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যেত।

আমি আমার ছোটো দুই ভাইয়ের সাথে পূর্বদিকের ঘরে ঘুমোই। মা-বাবা ঘুমোয় পাশের ঘরে। ঘরগুলো খুব বড়ো নয়, কেবল একটা তক্তা আর একটা বেল ছোটো আলমারি আছে। তাতেই ঘর ভর্তি। তিন জনের বেশি চারজন ঢুকলেই ঘরে দাঁড়ানো-বসার আর জায়গা থাকে না।

তখন আমার বয়স ১১-১২ বছর হবে। অগ্রহায়ণের শেষাশেষির সময়। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। আটটার মধ্যে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ বাড়ির চালে তাল গাছের শুকনো ডাল পড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরের মধ্যে মৃদু আলোয় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম পুরো দুটো বাজছে। তারপরেই চোখ গেল আলমারির কাছে। কেউ হেঁট হয়ে কিছু যেন করছে। মাকে দেখতাম আমাদের শুয়ে পড়ার পরও নানান কাজ করতেন। আমাদের সবার শেষে ঘুমোতে যেতেন। তবে এত রাতে মা! আমি ডাকলাম ‘মা’। কোনো সাড়া নেই, আবার ডাকলাম “মা-আ”। এবারেও সেই ছায়ামূর্তি থেকে কোনো জবাব পেলাম না। আলমাড়িতে অল্প কিছু টাকা ছিল। এই ভয় মনের মধ্যে উদয় হল যে, কোনো চোর নয় তো! এবারে জোড়ে ডাকতে লাগলাম “মা-আ-আ”, “মা-আ-আ”। এবারে সেই ছায়ামূর্তি দরজার দিকে সড়ে যেতে থাকল। আমার মনে ভয় আরও বাড়তে লাগল। আমার ডাকে পাশের ঘর মা-বাবা জেগে গিয়েছিল। ছায়ামূর্তি একেবারে দরজার বাইরে বেড়িয়ে গেল। বারান্দায় আলো জ্বলছিল, সেই আলোয় লক্ষ্য করলাম সেই ছায়ামূর্তির গায়ে ছিল একটা চাদর খুব সুন্দর উলের নকশা করা চাদর।

মা তখন এসে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। বুঝলাম দরজাতো ভিতর দিক থেকেই বন্ধ! আমার গোটা শরীরে ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। আমি এত শীতেও ঘামতে লাগলাম। ভয়ে আমি আর মাকে কোনো সাড়া দিতে পাড়লাম না। মায়ের ডাকে ভাইরাও জেগে গিয়েছিল। ভাই গিয়ে দরজা খুলল। মা ঘরে ঢুকে আমায় নানান কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আমি শুধুই তাকিয়ে রইলাম, আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেড়োল না।

এই ঘটনার পর পাঁচ-সাত দিন হয়ে গেছে। ভাইদের সাথে মাঠে ঘুড়ি উড়োতে গেছি। এই সময় ধান কাটা হয়ে গেছে। সব মাঠ ফাঁকা পড়ে আছে। কিছু কিছু মাঠ জল দিয়ে ভেজানো হয়েছে। কিছু কিছু মাঠ চষা হয়েছে। এমন সময় এক দমকা হাওয়ায় ঘুড়ির সুতো ছিড়ে ঘুড়ি উড়ে যেতে লাগল, আর আমরা ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে একেবারে শশ্মানের কাছে চলে গেছি। এর আগে আমি জানতাম না এখানে শ্মশান আছে। সেখানে একটা ঝোপের মধ্যে চোখ পড়তেই দেখলাম করেকটা জামা কাপড়ের সাথে একটা চাদর পরে আছে। তখনিই আমার সেই রাতের কথা মনে পরে গেল। আমার শরীরে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম – “ভাই এইগুলো এইখানে পড়ে আছে কেন ? কাদের এইগুলো ?” ভাই বলল – “গত মাসে যে ওপাড়ার ঠাকুমা মারা গেল এইগুলো তাঁর। হিন্দুদের তো মারা যাবার সময় যে পোশাক শরীরে থাকে সে সব আর কেউ ব্যবহার করে না। শশ্মানে তাকে দাহ করার পরে এইখানে সব ফেলে দিয়ে যায়।” আমার চোখের সামনে সেদিনের রাতের সব ঘটনা ভাসতে লাগল। মাথা ঝিম-ঝিম করতে লাগল, কানে কোনো শব্দ আসছিল না, চারিদিক অন্ধকার হয়ে যেতে লাগল। ভাইয়ের জোর ঠেলাতে সম্বিত ফিরে পেলাম। দেখি ভাইয়ের হাতে ঘুড়ি। আর কোনো কিছু না ভেবে ছুটতে লাগলাম। আমায় দেখে ভাইরাও আমার পিছনে ছুটতে লাগল। আমি কোনো দিক না দেখে কোনো কিছু না ভেবে এক ছুটে বাড়িতে এসে পড়লাম। চোখে শুধু ভাসছিল সেদিনের রাতের ছবি। সেই উলের নকশা করা চাদরের ছবি আর শশ্মানের পাশে পড়ে থাকা সেই একই চাদর বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

"আমার গ্রাম"

স্বাতী মুখার্জ্জী/ **রসায়ন বিভাগ/ প্রথম সেমেস্টার**

আমার গ্রাম মায়ের সমান
আমার নদী আমার বাঁক
সবই যেন তারি দান।
আমার নদীর দু-কুল বেয়ে
বইছে সে তার আপন খেয়ালে,
বেলে মাটি, এঁটেল মাটি সবই আমার গ্রাম
তাদের সাথে জড়িয়ে আছে আমার ছোট প্রাণ।
বাঁশের বন, আমের বন সবই আমার গ্রাম
এদের সাথে মিলে মিশে থাকে সবার প্রাণ।
গল্প লিখি ছড়া লিখি নদীর চরে বসি
পাখিরা সব আমায় দেখে বড্ড বেজায় খুশি।
সবজাতিরাই মিলে মিশে থাকি মোদের গ্রামে,
মায়ের আঁচল জড়িয়ে নিয়ে
থাকি মায়ের টানে।।

ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

বিধান সরেন/পঞ্চম সেমেস্টার/বাংলা বিভাগ

সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে, বাইরে বেরিয়ে দেখি বাবা মা কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি বাবার দুদিন ছুটি থাকার জন্য তারাপীঠ যাওয়া হচ্ছে। ঠিক হলো দুপুরের খাওয়াদাওয়া করে বেরিয়ে পড়ব। সেই মত আমরা সবাই খাওয়াদাওয়া করে বেরিয়ে পড়ি। বর্ধমান জংশন-এ গিয়ে দেখি অনেক কর্মরত ব্যাক্তিরা নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে যাচ্ছে। এবং হকাররা দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে নিজের জিনিস বিক্রি করছে। অবশেষে আমাদের ট্রেনের খবর দিল, এবং ট্রেনটি আসাতে আমরা ট্রেনটিতে উঠে পড়ি। তারপর ট্রেনটি রওনা হল। বেলা গড়াতে গড়াতে বিকেল। অবশেষে আমরা পৌঁছালাম নিজ গন্তব্যে। সেখানে আমরা যে হোটেলটাতে ছিলাম সেটা ছিল মন্দিরের পাশেই। সন্ধ্যের দিকে আমি এবং আমার ভাই দ্বারকা নদীর তীরে ঘুরতে গিয়েছিলাম। তারপরের দিন মা এবং বাবা পুজো দিতে যায় এবং ভাই আর আমি মন্দিরের চারপাশটা ঘুরে দেখছিলাম সঙ্গে শ্মশানও দেখলাম।আর সেখানে দেখলাম কিছু সন্ন্যাসী তপস্যা করছিল। এবং পরের দিন বাবার কাজ থাকায় আমাদেরকে ফিরে আসতে হয়।

পাখিদের দূর দেশে পাড়ি

সুপৃতি দত্ত

আকাশে উড়ে যাওয়া পাখিদের দেখে একবার উড়ার ইচ্ছা মনে জন্মায়নি এমন মানুষের সংখ্যা বোধ হয় খুব কম। কী অবলীলায় পাখি তার ডানা মেলে পাড়ি দেয় এক দেশ থেকে আর এক দেশে। যেখানে আমাদের তথা মানবজাতিকে প্রতিবেশি কোন দেশেই যেতে হলে সম্মুখীন হতে হয় কত রকম নিয়মের, সেখানে পাখিরা সুদূর সুমেরু থেকে কত কত দেশ পেড়িয়ে আসে ভারত বা তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে।

শীতকালে মাঠে-ঘাটে ঘোরার সময় দেখা পেতাম কত সব অপরিচিত পাখির তাদের কারোর গলা সাদা, মাথা লাল, আবার কারোর ডানায় সাদা-কালো ছোপ। এদেরকে বছরের ওই একটা সময়ই দেখতে পেতাম। ওরা আসলে পরিযায়ী পাখি। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে যখন শীত তখন দক্ষিন গোলার্ধে গ্রীষ্ম। উত্তর মেরু, ইউরোপ, রাশিয়া, ও উত্তর এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলই তো শীতকালে বরফের চাদরে মুড়ে থাকে। সেইখানকার বাসিন্দা সাইবেরিয়ান সারস, ধলা পাখি, সাদা গলার মাছরাঙা, রাঙ্গামুড়ি, গিরিয়া হাঁস খাবার জোগাড়ের জন্য ও প্রচন্ড ঠান্ডা এড়াতে বেরিয়ে পড়ে দূর দেশের উদ্দেশ্যে। তাদের প্রায় পাঁচ হাজার নয়শো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। আচ্ছা! আমরা যদি এমন দূরত্বের পথে রওনা দিতাম তবে কত পোঁটলা বাঁধতাম ? তার ওজন বোধ করি নিজের ওজনের দশগুন হত। কিন্তু পাখিগুলো সুদূর পথে পাড়ি দেয় শুধুমাত্র নিজের ডানাকে ভরসা করে। তাদের না আছে কম্পাস না আছে ম্যাপ। তারা সূর্য, চাঁদ, তারা, ও নিজের ঘ্রানেন্দ্রিয় দ্বারা নিজের মাত্রার সঠিক পথটা খুঁজে নেয় আর পোঁছে যায় নিজেদের অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশে।

পরিযান শুরুর অবশ্য অনেক আগে থেকেই পাখিদের শারীরিক বহু পরিবর্তন ঘটে। যেমন - তারা রাতে বেশি কাজকর্মে সক্রিয় হয়ে ওঠে আবার তাদের ঘুমের সময়ের পরিবর্তন ঘটে। আসলে পরিযানের সময় তাদের প্রধানত রাতেই বেশি উড়তে হয় কারন রাতে পরিবেশ থাকে বেশ আরামদায়ক ও বিভিন্ন শত্রুর আক্রমনের সম্ভাবনাও থাকে বেশ অনেকটা কম। পরিযান শুরুর আগে পাখিগুলো স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি পরিমান খাবার খায় যা তাদের শরীরে অতিরিক্ত তাপশক্তির সঞ্চয় ঘটায়। কোন কোন প্রজাতির পাখি উত্তর থেকে দক্ষিণে কেউ বা দক্ষিন থেকে উত্তরে পরিযান করে। আমাদের অতি পরিচিত পাখি কোকিল গোটা বসন্ত ভারতে অতিবাহিত করে গ্রীষ্মে পাড়ি দেয় দক্ষিন আফ্রিকার পথে। কোন প্রজাতি আবার পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার পশ্চিম থেকে পূর্বে পরিযান করে। এক দেশ থেকে আর এক দেশে উড়ে যাওয়ার সময় পাখিগুলো এক দেশের ফলের বীজ আর এক দেশে ছড়িয়ে দেয়। কোন প্রজাতি দল বেঁধে কেউ আবার একা একা পরিযান করে। অনেকসময় পাখিগুলো আকাশে V বা J আকৃতির মতন করে উড়ে যায় এর কারন অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানীরা

দেখেছেন এমন আকার করে উড়লে পাখিদের শক্তি প্রায় খুব কম ব্যয় হয়। কিছু প্রজাতির পাখিরা আবার সমুদ্রের উপকূল দিয়ে পরিযান করে নিজেদের শক্তির ব্যয় কম করে সমুদ্রের ঢেউ এর বলকে কাজে লাগিয়ে অতিক্রম করে দীর্ঘ পথ।

পাখিগুলোর যাত্রা পথে কখনো দীর্ঘ মরুভূমি, জলাশয়, বিশাল পাহাড় ও অনান্য ভৌগলিক বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। যাত্রা পথে উপযুক্ত আবহাওয়া না পাওয়া, অনাহার, অনান্য দীর্ঘ আঘাত, দীর্ঘ ক্লান্তিময় পথকে উপেক্ষা করেও প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে তারা বেরিয়ে পড়ে দূর দেশের পথে বেঁচে থাকার তাগিদে।

অঙ্কন ঃ পূর্বশা পালিত, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

Unemployment

Srijita Jash Sem V (Zoology) hons.

Unemployment is a very serious not only in India but in the whole world. It is a curse. It is unwelcome than a diseas. It is like a cancerous sore in our society. It weakens and degenerates the body and mind of our young population. There are many good schools, colleges and universities in our country. Every year thousands of Students pass out from there. But on the other hand, the rate of unemployment is increasing by leaps and bounds.

There are many reasons behind it. First of all, the over population of the country. Brings competition in all professionals sectors. Secondly, our education system is faulty; more bookish and then practical. At present, in every field of works robotic activities affect badly. Besides, in most the fields experienced candidates are more welcome than freshers which creates a major problem.

But we should cope up the situation by following ways:

- Rapid population should be controlled.
- Foresheses should be given advantage to build up their career.
- Job oriented course should be introduced in academic fields.
- Competetive examinations should be held regular courses.
- Games and sports should be given more importance in the field of service.

নারী কথা

- পিংকি মাজি/পঞ্চম সেমেস্টার/ প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

কন্যা শিল্প হলেই তুমি
দেখি কি তোমার বলো ?
কোন পুরুষের গর্ভে তুমি
জন্ম নিয়েছো বলো ?
আজনে তুমি নিজে পুরুষ
সেই অবদান কার!
নারীর গর্ভে জন্ম নিয়েই
ধরছ নারীর ঘাড়়।
কোন শিশুটা পুরুষ হবে
কোন শিশুটা নারী
তা ঠিক করে দেন সৃষ্টিকর্তা
ঠিক করেন না নারী।
বিয়ের পিঁড়ি স্বপ্ন দেখায়
সুখে থেকো কন্যা,
বাবার বুকে জমে জল
মায়ের চোখে বন্যা।
নারী মানে কি,
শুধুই তার যোনি, জরায়, স্তন !!
নারী মানে কারোর বাড়ির
মা, দিদি, স্ত্রী অথবা বোন।
নারী মানে একজন ধর্ষিতা
বেদনানিহীন দুক্ষিতা।
নারী মানে তো দেবী,
উৎসবে মাতায় সার্বজনীন
যার এক হাতে সৃষ্টি আর অন্য সূতে অসুর নিধন।

নারীকে বলো “কালো তুমি লাগা হলুদ
ফর্সা হবে স্কিন !
মাটির শ্যামার নৈবেদ্যতে
কি দিয়েছে ! ফর্সা হবার ক্রিম !!”
এবার তো একটু সরম করো
দুনিয়া বলবে কি ?
আরে ভাই দুনিয়ার দোষ কি ?
সমাজটাই এরকম-ই।

সর্পদংশন

দেবস্মিতা সাঁই

সর্পদংশন (ইংরেজি: Snake bite) হচ্ছে একপ্রকার আঘাতগ্রস্ততা, যা সাপের কাপড়ের সাধ্যমে হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই আঘাতটি সংঘটিত হয় প্রাণীটির বিষদাঁতের কামড়ের ফলে শরীরে বিষ প্রবেশের (enveromation) মাধ্যমে। সাপের বেশিরভাগ প্রজাতি নির্বিষ এবং সাধারনত তারা শিকার করে শিকারকে চারপাশ দিয়ে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে। তুলনামূলক অল্প সংখ্যক সাপই বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে শিকারকে হত্যা করে। গড়ে পৃথিবীতে জাতি সাপের ৩,০০০ প্রজাতি পাওয়া যায়, যার মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশের দংশন মানুষের জন্য বিপজ্জনক, অ্যান্টার্কটিস ব্যতীত পৃথিবীর সকল স্থানেই বিষধর সাপের দেখা মিলে।

সাপ সাধারণত শিকারের জন্যই দংশন করে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নিজেকে হুমকির সম্মুখীন মনে করলে ক্ষতিসাধন এড়াতেও তারা দংশন করে। যেহেতু একই সাপ দেখতে বিভিন্ন রকম হতে পারে, তাই নির্দিষ্ট কোনো প্রজাতি নির্নয় করা কষ্টসাধ্য। এজন্য সঠিক চিকিৎসা পেতে অবশ্যই পেশাদার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। সর্পদংশনের ফলাফল বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন: সাপটির প্রেজাতি, শরীরের কোন স্থানে কামড় দেওয়া হয়েছে, কতোটুকু বিষ প্রবেশ করানো হয়েছে, এবং যাকে কামড় দেওয়া হয়েছে তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা। আতঙ্কগ্রস্ত বোধ করা সর্পদংশনের পর হওয়া একটি সাধারন অনুভূতি। অটোমেটিক নার্ভাস সিস্টেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই অনুভূতি সর্পদংশনের পর বিভিন্ন রকম আচরনের প্রকাশ ঘঠাতে পারে। যেমন: ট্রাইকার্ডিয়া (বুক ধুকধুক করা), ও নসিয়া। সাপের দংশনে আঘাতগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। সাপের দাঁতের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত জীবাণু সংক্রমনের সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া কামড়ের মাধ্যেমে অ্যানাফাইলেকটক বিক্রিয়ার সৃষ্টিও হতে পারে যা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। সর্পদংশন পরবর্তী প্রাথমিক চিকিৎসা সাপের বিস্তৃতি অঞ্চল ও সাপের প্রজাতির ওপর নির্ভর করে। সেজন্য এক প্রজাতির সাপের জন্য কার্যকর প্রার্থমিক চিকিৎসা অপর প্রজাতির জন্য কার্যকর নাও হতে পারে।

সর্পদংশনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ততার হার ভৌগোলিক অঞ্চল অনুসারে পরিবর্তিত হয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় কমাতে বিশেষ ধরনের জুতা ও সাপের পাদুর্ভাব আছে এমন অঞ্চল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন।

অঙ্কন ঃ পূর্বশা পালিত, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

অপত্য স্নেহ

মৌমি মোদক

আমরা কখনো কী ভেবে দেখেছি যে পিতা মাতা ও সন্তানের মধ্যে যে সম্পর্ক মানুষ অথবা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্য দেখা যায়, তার থেকে নীচু শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও কী তা দেখা যায় ? একজন পিতামাতা যেমন তার সন্তানকে লালন পালন করে বড়ো করে তোলে, নীচু শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও কী এমন কিছু দেখা যায় ?

সৃষ্টির শুরু থেকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। কিন্তু বিজ্ঞান পড়লে আমরা জানতে পারি সৃষ্টির শুরুতেই কিন্তু মানুষ বা আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়নি। প্রথমে পৃথিবী জুড়ে ছিল শুধুই গরম তরল স্যুপ, তারপর পৃথিবীতে অতি সুক্ষ প্রাণের সৃষ্টি হয় এবং বহু বিবর্তনের পর সৃষ্টি হয় মানব সমাজ। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বহু অজানা তথ্য আবিষ্কার করেছে।

পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়ে টিকে থাকার যে লড়াই, সেখানে মানুষ বা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের থেকে নীচু শ্রেণীর প্রাণীরা কীভাবে তাদের সন্তানদের জন্ম দেয়, কীভাবে কতোটা সময় পর্যন্ত তাদের দেখাশোনা করে, কীভাবে নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে বিপদ থেকে রক্ষা করে তা আমরা বেশীরভাগ মানুষ-ই জানি না। নীচু শ্রেনীর প্রাণীদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক প্রজাতি আছে যাদের সম্পর্কে জানতে হলে গোটা কয়েক বই শেষ হয়ে যাবে অথচ জানা শেষ হবে না। তাই এখন আমরা কেবলমাত্র যেকোনো একটি শ্রেণী সম্পর্কেই জানবো।

শ্রেণী : উভচর

এই শ্রেণীতে প্রায় সাড়ে আট হাজারের মতো বা তার থেকেও বেশী প্রজাতির প্রাণী আছে। তাদের মধ্যে থেকে কিছু উভচর প্রাণী সম্পর্কে আলোচনা করবো। উভচর প্রাণীদের প্রজনন কৌশল ও বাচ্ছাদের লালন পালনের পদ্ধতি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও বিবর্তনের একটি অনন্য উদাহরণ। তারা তাদের ডিম রক্ষা ও বিকাশের জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে। সুরক্ষার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উভচরেরা তাদের অপত্যদের নিজেদের কাছেই রাখে। ইকথায়োপিস নামক উভচরেরা ডিম পাড়ার পর সেই ডিম নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে রাখে এবং ডিম ফেটে বাচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত তাদের রক্ষা করে। আবার কিছু ব্যাঙের ক্ষেত্রে দেখা যায় ডিম ফুটে লার্ভা হওয়ার পর তারা মুখ অথবা পিঠে করে সেই সব লার্ভাকে নিরাপদ কোনো জলজ স্থানে নিয়ে যায়। বিন্দু উভচরেরা ডিম পাড়ার পর তো সেগুলি নিজের দেহের সঙ্গেই জুড়ে রাখে। Salamander নামক উভচরেরা তাদের ডিমগুলি মালার মতো গলার চারপাশে জড়িয়ে সেগুলি বহন করে। গেছো ব্যাঙের একটি বিশেষ গোষ্ঠী (মারসুপিয়াল ব্যান্ড) সেখানে স্ত্রী ব্যাঙ পিঠে করে নিজের ডিম বহন করে (স্ত্রী ব্যাঙের পিঠে এক বিশেষ ধরনের গর্ত থাকে যার সাহায্যে তারা এই কাজ করে। এই গর্ত খোলা অথবা বন্ধ অবস্থায় থাকে)। আরও এক প্রজাতির ব্যাঙ আছে যাদের পুরুষদের ক্ষেত্রে শ্বাসথলি তুলনামূলকভাবে বড়ো এবং তারা সেই শ্বাসথলিতে সর্বোচ্চ দুটি নিষিক্ত ডিম প্রবেশ করায়। সেখানে ডিমগুলি পুরোপুরি

বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সম্পূর্ণ গঠিত ব্যাঙছানা রূপে বের হয়। এছাড়া আরও অনেক রকম ভাবে উভচরেরা তাদের অপত্যদের জন্ম দেয় ও রক্ষা করে, তবে যেটি না বললেই নয় সেটি হল কিছু বিশেষ উভচরেরা তাদের ডিম শরীরের মধ্যেই ডিম্বনালীর ভিতর রাখে এবং সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া শুধু উভচর প্রাণীদের প্রজনন কৌশলের বৈচিত্র্যই তুলে ধরে না, বরং এটি উভচরদের অস্তিত্ব বজায় রাখার এবং নতুন পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। তাদের প্রজনন কৌশল এবং বাচ্চাদের প্রতিপালনের বৈচিত্র প্রকৃতির এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে এক গভীর 'অপত্য স্নেহ' যা পিতামাতার ত্যাগ এবং তাদের বংশধরদের সুরক্ষা ও বিকাশ নিশ্চিত করার এক চমৎকার উদাহরণ। এই 'অপত্য স্নেহ' শুধুমাত্র উভচর না, গোটা প্রাণী জগতের বিবর্তনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, এটি প্রাকৃতির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যা বংশধরদের নতুন জীবনের সূচনা ও প্রজাতির ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করে।

অঙ্কন ঃ পূর্বশা পালিত, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

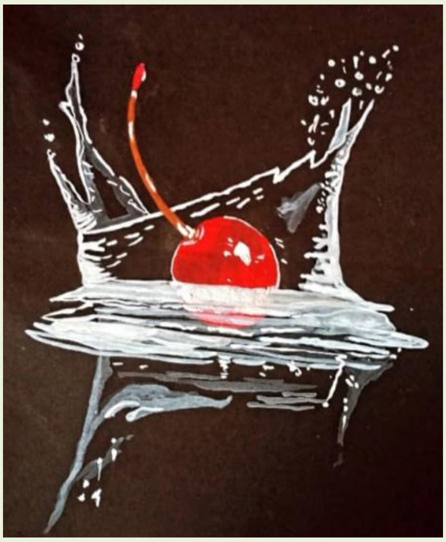

অঙ্কন ঃ পূর্বশা পালিত, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

অঙ্কন ঃ সুদীপ খাঁ, দর্শন বিভাগ